আবার সরমা-পণিসূক্তে পাওয়া যায়—

গো-অপহরণকারী পণি নামক দস্যুদের সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছে সরমা। তাকে পণিরা বলছে—তুমি কেন এসেছ? কয় রাত্রি ধরে এসেছ? নদী পার হলে কিরূপে?

সরমা—ইন্দ্রের দূতীরূপে এসেছি। তোমরা যে গোধন সংগ্রহ করেছ, তা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা।

পণি—সেই ইন্দ্র কিরূপ? তিনি আসুন, তাঁহাকে আমরা বন্ধুভাবে নিব। তিনি আমাদের গাভী গ্রহণ করে গাভীগণের স্বত্বাধিকারী হউন।

সরমা—সেই ইন্দ্রকে পরাজিত করতে পারে এরূপ ব্যক্তি নেই। তিনি সকলকে পরাজিত করেন। তোমরা তাঁর হস্তে নিহত হবে।

পণি—আমাদের গাভীগণ থেকে যে কয়টি তোমার ইচ্ছা তোমাকে দিচ্ছি। বিনা যুদ্ধে কে তোমাকে এই গাভী দিত?

সরমা—তোমরা যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হও, তোমাদের গৃহে আমার পথ যেন দেবতারা আক্রমণ না করেন।

পণি—আমাদের এই ধন পর্বতদ্বারা রক্ষিত। তুমি বৃথাই এখানে এসেছ।

সরমা—ঋষি ও অঙ্গিরার সন্তানগণ সোমপানে উৎসাহিত হয়ে এসে এই সকল গাভী ভাগ করে নিবেন। তখন তোমাদের দর্প চূর্ণ হবে।

পণি—তোমাকে আমরা ভগ্নীরূপে গ্রহণ করছি, তুমি ফিরে যেও না, তোমাকে এই গোধনের ভাগ দিচ্ছি।

সরমা—আমি গাভীর জন্য এখানে প্রেরিত হয়েছি। তোমরা এ-স্থান থেকে পলায়ন কর। গাভীগণ কষ্ট পাচ্ছে, ওরা ধর্মের আশ্রয়ে এখান থেকে চলুক।

পুরূরবা-উর্বশী অংশের সংলাপে পাওয়া যায়—

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী মর্ত্যের রাজা পুরূরবার সঙ্গে কিছুকাল থাকার পরে অন্তর্হিতা হলেন। বিরহবিধুর শোকার্ত রাজা তাঁকে দেখে বলছেন—তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! তুমি শীঘ্র যেও না, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আবশ্যক।

উর্বশী—তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে কি হবে? তুমি নিজ গৃহে গমন কর। আমি প্রথম উষার ন্যায় চলে এসেছি। বায়ুকে যেমন ধরা যায় না, তেমন তুমিও আমাকে ধরতে পারবে না।

পুরূরবা—তোমার বিরহে আমি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি নি, রাজকার্য শোভাহীন হয়েছে, আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করার চিন্তা ত্যাগ করেছে।

হে উষাদেবী, সেই উর্বশী শ্বশুরকে ভোজনসামগ্রী দিতে ইচ্ছা করলে সন্নিহিত শয়ন গৃহে যেতেন, সেখানে স্বামীর সঙ্গসুখ ভোগ করতেন।

উর্বশী—তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে আলিঙ্গন করতে। কোন সপত্নীর সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তোমার গৃহে আমি এলাম; তুমি আমার রাজা, তুমি আমার অশেষ সুখবিধান করলে।

পুরূরবা—আমার অন্য যে সকল মহিলা ছিল তারা, তুমি আসবার পরে, আর আমার নিকট বেশভূষা করে আসত না।

উর্বশী—তুমি জন্মগ্রহণ করলে দেবমহিলারা দেখতে এসেছিলেন, নদীরা সংবর্ধনা করতে এসেছিল, দেবতারাও সংবর্ধনা করতে এসেছিলেন।

পুরূরবা—পুরূরবা মনুষ্যরূপে যখন অপ্সরাদের নিকট অগ্রসর হলেন তখন তাঁরা নিজ রূপ ত্যাগ করে অন্তর্হিত হলেন।

উর্বশী—পুরূরবা মনুষ্য হয়ে দেবলোকবাসিনী অপ্সরাদের সঙ্গে কথা বলতে এবং তাঁদের শরীর স্পর্শ করতে অগ্রসর হলেন তখন তাঁরা অদৃশ্য হলেন।

পুরূরবা—যে উর্বশী আকাশ থেকে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করেছিল এবং আমার সকল মনোবাসনা পূর্ণ করেছিল, তাহার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে পুত্র জন্মগ্রহণ করল। উর্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ু করুন।

উর্বশী—আমি তোমাকে সর্বদা বলেছি, কি হলে তোমার নিকট আমি থাকব না। তুমি তা শুনলে না। এখন পৃথিবীর পালন কর্ম ত্যাগ করে কেন বৃথা বাক্যব্যয় করছ?

পুরূরবা—তোমার পুত্র কবে আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করবে? যদি সে আসে তাহলে কি সে রোদন করবে না? পরস্পরপ্রীতিযুক্ত স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদ কে ঘটাতে চায়? তোমার শ্বশুরালয় যেন অগ্নিপ্রদীপ্ত হয়েছে।

উর্বশী—পুত্র তোমার নিকট গিয়ে অশ্রুবিসর্জন করবে না। পুত্রকে তোমার নিকট পাঠাব, আমি মঙ্গল চিন্তা করব। হে নির্বোধ, ফিরে যাও, আমাকে আর পাবে না।

পুরূরবা—তবে তোমার প্রণয়ী আজ দূর হয়ে যাক্, বৃক কর্তৃক ভক্ষিত হোক্।

উর্বশী—তুমি মৃত্যু কামনা করো না। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় বৃকের হৃদয়ের ন্যায়।

পুরূরবা—আমি তোমাকে আলিঙ্গন করছি। ফিরে এস, আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে।

উর্বশী—দেবগণ তোমাকে বলছেন যে, তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হবে, দেবগণের হোম করবে, স্বর্গে গিয়ে আনন্দ করবে।

এই সূক্তগুলির সংলাপাংশ নিঃসন্দেহে নাট্যধর্মী।

কতক বৈদিক অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তির উপরে অপরের ব্যক্তিত্ব আরোপিত হত। এই ব্যাপার থেকেই কেউ কেউ নাটকের সূত্রপাত অনুমান করেন; নাটকেও রূপের আরোপ হয়। সোমযাগের জন্য সোমক্রয়ের ব্যাপারে দেখা যায়, রূপকানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রেতাকে প্রহার করে সোম নিয়ে যাওয়া হয়।

মহাব্রত নামক অনুষ্ঠানে একটি রূপকে দেখান হয়, একটি সাদা গোলাকার চামড়ার জন্য বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে সংগ্রাম, জয় অবশ্য বৈশ্যের[১]। এ-ধরনের রূপককে কেউ কেউ নাট্যকলার অগ্রদূত মনে করেন।

ম্যাক্স্‌মূলার মনে করেন যে, সময়বিশেষে কোন কোন সংবাদসূক্ত অবলম্বন করে অভিনয় করা হত; যেমন একপক্ষ ইন্দ্র, অপরপক্ষ মরুদ্‌গণের অনুকরণে কথা বলত।

লেভি দেখিয়েছেন যে, বৈদিক যুগে সঙ্গীতের উন্নতির সাক্ষী সামবেদ। ঋগ্বেদে (১.৯২.৪) দেখা যায়, কুমারীগণ উজ্জ্বল সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রেমিকের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করছে। অথর্ববেদে (১২.১.৪১) পুরুষকে দেখা যায়, সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করছে। এ সকল বিষয় লক্ষ্য করে কীথ্‌ মনে করেন, ঋগ্বেদের যুগে ধর্মীয় দৃশ্যাবলী অভিনীত হত—ঐগুলিতে স্বর্গের ঘটনা মর্ত্যে অনুকরণের উদ্দেশ্যে পুরোহিতগণ দেবতা বা মুনিগণের ভূমিকা গ্রহণ করতেন।

ভিডিশ্‌, ওল্ডেনবার্গ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, উক্ত সূক্তগুলিতে ঋক্‌সমূহের যোগসূত্র হিসাবে একসময়ে গদ্যাংশও ছিল। কালক্রমে আবেগময় ও রসাত্মক শ্লোকগুলিই রক্ষিত হয়েছে, গদ্যাংশ লুপ্ত হয়েছে। এর থেকেই নাকি নাট্যগ্রন্থে পদ্যগদ্যের সংমিশ্রণ প্রচলিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত পিশেল মনে করেন, সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত পুতুল নাচ থেকেই নাটকের ধারণা জন্মেছিল। এতে কতক পুতুলে নানা চরিত্রের কার্যকলাপ আরোপিত হত এবং সুতো টেনে ঐগুলিকে চালান হত। এই মতবাদের প্রমাণস্বরূপ প্রস্তাবনা অর্থে স্থাপনা এবং সূত্রধার কোন কোন নাট্যগ্রন্থে এই শব্দ দুইটির ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়।

১। সাংখায়ন আরণ্যক, কীথ্‌, পৃ. ৭২ থেকে।

অপর পণ্ডিত হিল্লেব্রাণ্ড্ (Hillebrandt) মনে করেন যে, নাটকের অনুকরণেই পুতুলনাচের প্রবর্ত্তন হয়েছিল।

লুডার্স এবং কোনোর মতে, প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছায়ানাটক থেকে নাট্যকলার উদ্ভব হয়েছিল। এই মতবাদও সংশয়াতীত নয়।

বসন্তোৎসব ছিল নাট্যকলার মূলে—এরূপ একটি মত আছে।

পণ্ডিত রিজ্ওয়ে মনে করেন, পরলোকগত পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশে বিহিত অনুষ্ঠানের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপই নাট্য।

উক্ত মতবাদগুলির পক্ষে ও বিপক্ষে নানাপ্রকার যুক্তি আছে। তবে, কীথ্ প্রমুখ কতক পণ্ডিত মনে করেন যে, ধর্ম বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নাট্যকলার উৎস। তাঁদের মতে, দুইটি ব্যাপার বিশেষভাবে নাট্যকলার প্রেরণা দিয়েছিল—একটি 'রামায়ণ' 'মহাভারতের' ব্যাপক আবৃত্তি, অপরটি কৃষ্ণলীলার নাটকীয় ঘটনাবলী। কৃষ্ণকাহিনীর নাটকীয় ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তরুণ কৃষ্ণ কর্তৃক প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ ও শত্রুর পরাভব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেবর (Waber) ও তাঁর ভিণ্ডিশ্ প্রমুখ সমর্থকগণের মতে, আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭-৩২৬) পরে এদেশে গ্রীক্ নাটক অভিনীত হয় এবং গ্রীক্ থিয়েটারের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় (যথা ছোটনাগপুরে রামগড় পাহাড়ে সীতাবেঙ্গা গুহায়)। তখন থেকেই ভারতবাসী অভিনয় অভ্যাস করে।

এই মতের সমর্থনে প্রধান যুক্তিগুলি এইরূপ। সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থে 'যবনিকা' শব্দটি যবন শব্দ থেকে নিষ্পন্ন; যবন অর্থাৎ গ্রীসদেশবাসী। রাজার দেহ-রক্ষিণীরূপে কোন কোন নাট্যগ্রন্থে যে 'যবনী' শব্দের উল্লেখ আছে, তাও যবন পদ থেকে এসেছে। গ্রীক্ নাটকের সঙ্গে ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের বস্তুগত সাদৃশ্য আছে। যেমন, অজ্ঞাত কোন যুবতীর প্রতি রাজার অনুরাগ, বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যুবতীর পরিচয় লাভ ও তার সঙ্গে রাজার পরিণয়—এরূপ ব্যাপার উভয় দেশের গ্রন্থেই আছে। পরিচয়জ্ঞাপনে স্মারক দ্রব্যের প্রয়োগ (যথা—শকুন্তলা নাটকে আংটি, 'বিক্রমোর্বশীয়ে' সংগমনমণি) উভয় দেশের গ্রন্থেই আছে। প্রেমঘটিত ব্যাপারের সঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনার সংমিশ্রণ (যেমন 'মৃচ্ছকটিকে') নাকি গ্রীস্‌দেশ থেকে প্রাপ্ত। 'মৃচ্ছকটিকে' বিচারালয়ের দৃশ্য এই মতাবলম্বি-গণের মতে গ্রীক আদর্শে রচিত। প্রেমিকা ক্রীতদাসীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে চৌর্য (যেমন 'মৃচ্ছকটিকে') এবং গ্রীক্ নাটকের নায়ক কর্তৃক তদীয় প্রিয়পাত্রীকে

ক্রয়ের জন্য অসদুপায় অবলম্বন—এই দুইয়ের সাদৃশ্য আছে। 'মৃচ্ছকটিক' নামের সঙ্গে গ্রীক্ নাটক Cistellaria (ক্ষুদ্র সিন্দুক) ও Aulularia (ক্ষুদ্রভাণ্ড)-র সাদৃশ্য দেখান হয়েছে। গ্রীক্ Aristotle-এর নির্দেশানুসারে একদিন বা তার কিছু বেশি সময়ের মধ্যে নিষ্পাদ্য ঘটনাবলী নাটকীয় বস্তুরূপে গৃহীত হতে পারে। বলা হয়েছে, এরই প্রভাবে সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নাটকের অংক হবে নানেকদিননির্বত্য কথাভিঃ সংপ্রযোজিতঃ; অর্থাৎ, অংকে বর্ণিত ঘটনা একদিন নিষ্পাদ্য হবে।

ভিডিশ্ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থের বিট, বিদূষক ও শকারের সঙ্গে গ্রীক্ রোমান নাটকের Parasite, Servus,currens ও miles gloriosus-এর অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

কোন কোন ব্যক্তি গ্রীস্‌দেশীয় সঙ (mime) থেকে ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি অনুমান করেছেন। গ্রীক্ সঙ মুখোস বা অতি উঁচু তলাযুক্ত বুটজুতো (buskin) ব্যবহার করত না; ভারতীয় নাট্যেও এগুলির ব্যবহার ছিল না। সঙে, অন্তত রোমানদের পরিচালনায়, পর্দা ব্যবহৃত হত, ভারতীয় নাট্যাভিনয়েও যবনিকা ছিল। ভারতীয় নাট্যের ন্যায় গ্রীক সঙেও বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হত এবং অনেক পাত্র থাকত। তা ছাড়া গ্রীক্ সঙের Zelotypos ও Mokos-এর সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যের যথাক্রমে শকার ও বিদূষকের কিছু সাদৃশ্য আছে। উভয়দেশের নাট্যগ্রন্থের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থনাম এবং সহানুভূতি সহকারে নাটকটিকে গ্রহণের জন্য নাট্যকারের অভিপ্রায় ঘোষিত হয়েছে।

উভয় দেশের নাট্যেই বস্তু প্রাধান্য লাভ করেছে।

ভারতীয় নাট্যে চরিত্রগুলি ত্রিবিধ—উচ্চ, মধ্যম ও নীচ। এরিস্টটলের ideal (আদর্শ), real (বাস্তব) ও inferior (নিকৃষ্ট) চরিত্রগুলি প্রায় উক্ত তিন শ্রেণীর অনুরূপ।

এরিস্টটলও 'নাট্যশাস্ত্রে'র ন্যায় পুরুষ-নারীর চরিত্রের ভেদ সম্বন্ধে সচেতন।

এরিস্টটলের ন্যায় 'নাট্যশাস্ত্রে'ও নট ও দর্শকের চিত্তে যে ভাবোদয় হয়, তার সম্বন্ধ লক্ষিত হয়েছে।

উভয় দেশেই তাৎপর্যপূর্ণ নাম ও নাট্যে প্রযুক্ত ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

কারও কারও মতে, সংস্কৃত একাংক নাটক গ্রীক্ mime দ্বারা প্রভাবিত।

উক্ত মতের বিরুদ্ধে কতক যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। এই যুক্তিগুলি গ্রীক্ ও ভারতীয় নাট্যকলা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' একটি প্রাচীন ঐতিহ্য এই যে, স্বয়ং ব্রহ্মা নাট্যগ্রন্থ বা দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি করেন এবং নিজে 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' নামক দু-খানি দৃশ্যকাব্য রচনা করেন।

এই আখ্যানকে অলীক মনে করলেও কতক প্রমাণ থেকে ভারতে গ্রীক্ আগমনের দীর্ঘকাল পূর্বেই যে নাটকের প্রচলন ছিল তা মনে করা যায়। 'যজুর্বেদে' (বাজসনেয়ি সংহিতা ৩০.৪, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩. ৪. ২.) শৈলূষ শব্দের প্রয়োগ আছে। এই শব্দে পরবর্তীকালে নট বা অভিনেতাকে বোঝালেও সেকালে সঙ্গীতজ্ঞ বা নর্তককেও বোঝাত। পাণিনির (আঃ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থশতক) 'অষ্টাধ্যায়ী'তে (৪. ৩. ১১০ থেকে) শিলালী ও কৃশাশ্বকৃত 'নটসূত্রে'র উল্লেখ আছে। সুতরাং, নাটকের আবির্ভাব আরও বহুকাল পূর্বে হয়েছিল বলে অনুমান অসঙ্গত নয়; যেমন পূর্বে ভাষার উৎপত্তি হয়, পরে রচিত হয় ব্যাকরণ, তেমনই পূর্বে নাটকের উদ্ভব এবং পরে নটসূত্র বা নাট্যশাস্ত্রের রচনা—এই স্বাভাবিক ক্রম। পতঞ্জলির (আঃ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) 'মহাভাষ্যে' নাটকের অস্তিত্বের প্রমাণ নিঃসন্দিগ্ধ।

নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিবর্তনধারা

নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে উপলভ্যমান গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভরতের নামাঙ্কিত 'নাট্যশাস্ত্র' প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। 'নাট্যশাস্ত্রে' (১. ২৬-৩৯) ভরতের একশত পুত্রের নামোল্লেখ আছে। এঁদের মধ্যে কোহল, দত্তিল, নখকুট্ট, অশ্মকুট প্রভৃতির নাম নাট্যকলা বিষয়ক পরবর্তীকালের নানাগ্রন্থে আছে।

নন্দী (নন্দিকেশ্বর), তুম্বুরু, সদাশিব, পদ্মভূ, দ্রৌহিণী, ব্যাস, আঞ্জনেয় প্রভৃতি লেখকগণের উল্লেখ বা তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি আছে অভিনবগুপ্ত ও সারদাতনয়ের গ্রন্থে। সাগরনন্দী চারায়ণ নামে এক গ্রন্থকারের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অভিনব ও সাগরনন্দী কাত্যায়ন, রাহুল ও গর্গের উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য নামের মধ্যে শকলিগর্ভ ও ঘণ্টকের উল্লেখ করেছেন অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্ত বার্তিককার, হর্ষ প্রভৃতির রচনা থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সাগরনন্দীও হর্ষবিক্রম বা হর্ষের উল্লেখ করেছেন।

নাট্যকলা সম্বন্ধে সারদাতনয় সুবন্ধু নামক একজনের উল্লেখ করেছেন। এই

সুবন্ধু 'বাসবদত্তা'কার সুবন্ধুর (৮ম শতকের প্রথম ভাগের পরবর্তী) সহিত অভিন্ন কিনা বলা যায় না।

নাট্যশাস্ত্র অতি বিস্তৃত। সুতরাং, বহুকাল পূর্বেই এ-বিষয়ে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। ফলে কিছুসংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ধারারাজ মুঞ্জর (৯৭৪-৯৫ খ্রীস্টাব্দ) আশ্রিত ও বিষ্ণুর পুত্র ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক'। 'নাট্যশাস্ত্রে' প্রধান নাট্যগ্রন্থগুলিকে দশভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; এই দশবিধ রূপকই ধনঞ্জয়ের আলোচ্য। ধনঞ্জয় ভরতকেই অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি দুই একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন; যথা—নায়িকার নতুন শ্রেণীবিভাগ এবং শৃঙ্গাররসের নূতন ভাগ। তিনি 'নাট্যশাস্ত্রে'র বহু বিষয় বর্জন করেছেন।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের চারখানি গ্রন্থ আমাদের কাছে পৌছেছে। বিদ্যা-নাথের 'প্রতাপরুদ্রীয়' 'দশরূপক' অবলম্বনে রচিত। এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। বিদ্যাধরের 'একাবলী' অপর একখানি গ্রন্থ। এতে গ্রন্থকারের বুদ্ধিদীপ্ত আলেচনা লক্ষণীয়। পরবর্তীকালের নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদার দাবি রাখে বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ'। বিশ্বনাথ প্রধানত ধনঞ্জয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে এমন বহু বিষয়ের অবতারণা করেছেন যেগুলি 'দশরূপকে' নেই। একই শতকের 'রসার্ণবসুধাকর' রাজাচল এবং বিন্ধ্য ও শ্রীশৈলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা শিঙ্গভূপাল রচিত।

মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ রূপ গোস্বামীর (খ্রী: ১৬শ শতকের প্রথম ভাগ) 'নাটকচন্দ্রিকা' অপর একখানি গ্রন্থ। এতে গ্রন্থকার বিশ্বনাথের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভ্রম-প্রমাদের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু রূপের গ্রন্থে বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নেই।

সুন্দরমিশ্রের 'নাট্যপ্রদীপ' (১৬১৩ খ্রীস্টাব্দ)-এর উপজীব্য 'দশরূপক' ও 'সাহিত্যদর্পণ'।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'অগ্নিপুরাণে' (৩৩৭—৪১) নাট্যকলা বিষয়ক কিছু আলোচনা আছে। এতে অভিনবত্ব নেই; নাট্যশাস্ত্রের কতক অংশ হুবহু বা কিছু পরিবর্তন সহ এতে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে নাট্যশাস্ত্রের মূলের পাঠান্তর সম্বন্ধে এই পুরাণ কিছু আলোকপাত করে। কানে মহাশয়ের মতে, এই পুরাণের উদ্ভবকাল ৯০০ খ্রীস্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' (আ: ৪৫০-৬৫০ খ্রীস্টাব্দ) নাট্যকলাবিষয়ক আলোচনা নাট্যশাস্ত্রের অনুসারী।

নন্দিকেশ্বরের নামাঙ্কিত 'অভিনয়দর্পণ' নামক একখানি গ্রন্থ আছে।

সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ' নামক গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে প্রধান প্রধান লেখকগণের মতামত আলোচিত হয়েছে। এতে বহু নাট্যগ্রন্থ ও নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। সাগরনন্দী খ্রীস্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়।

রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র (খ্রীঃ দ্বাদশ শতক) নামক দুই ব্যক্তি যুগ্মভাবে 'নাট্য-দর্পণ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এতে চির প্রচলিত দশরূপকের স্থলে দ্বাদশ প্রকার রূপকের উল্লেখ আছে।

মহিমভট্টের 'ব্যক্তিবিবেকে'র উপরে কাশ্মীরবাসী রুয্যক বা রুচকের (আঃ ১২শ শতক) টীকায় রুয্যক কৃত 'নাটকমীমাংসা'র উল্লেখ আছে; গ্রন্থখানি অনাবিষ্কৃত।

সারদাতনয়ের (১২শ শতক) 'ভাবপ্রকাশন' নামক গ্রন্থে নাট্যকলা সম্বন্ধে মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সিংহভূপাল বা শিঙ্গভূপালের (১৪শ শতক) 'রসার্ণবসুধাকরে' নাট্যকলা বিষয়ক আলোচনা আছে। এই গ্রন্থকারের 'নাটকপরিভাষা' নামে আর একটি গ্রন্থের কথা জানা যায়। এটিও অনাবিষ্কৃত।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থের নাম মাত্র জানা যায়। কতক অপ্রকাশিত গ্রন্থ পুঁথি আকারে নানাস্থানে সংরক্ষিত আছে।

বিদ্যানাথের 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণে'র উপরে কুমারস্বামীর 'রত্নাপণ' টীকায় বসন্তরাজকৃত 'নাট্যশাস্ত্রে'র উল্লেখ আছে; এর গ্রন্থকার তেলেগুদেশের রাজা কুমারগিরি (খ্রীঃ ১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)। 'বসন্তরাজীয় নাট্যশাস্ত্রে'র উল্লেখ 'শিশুপালবধে'র (২.৮) টীকায় মল্লিনাথও করেছেন। তাছাড়া, সর্বান (আঃ খ্রীঃ ১২শ শতক) 'অমরকোশে'র টীকায় এর উল্লেখ করেছেন।

কুমারস্বামীর উক্ত টীকায় 'নাটকপ্রকাশ' নামক একখানি গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

নাট্যের উদ্দেশ্য

এই উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—আনন্দদান ও উপদেশপ্রদান। ধনঞ্জয় 'দশরূপকে' বলেছেন যে, আনন্দনিস্যন্দী রূপকে যে শুধু ব্যুৎপত্তি খোঁজে সে উপহাসাস্পদ।

নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা

ঐতিহ্য এই যে, 'নাট্যশাস্ত্র' ভরতমুনি কর্তৃক রচিত। কিন্তু, গ্রন্থের নানা-স্থানে প্রক্ষেপ ও পুনর্বিন্যাস স্পষ্ট। কাব্যমালা সংস্করণের সমাপ্তিসূচক বাক্যে গ্রন্থের শেষাংশ 'নন্দিভরত' আখ্যায় অভিহিত হয়েছে। 'নন্দিভরত' নামে একখানি সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। এমন হতে পারে যে, ভরতের গ্রন্থের শেষাংশে সঙ্গীত অন্যতম আলোচ্য বিষয় বলে নন্দিকেশ্বরের মতানুসারে ঐ অংশ পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল।

'নাট্যশাস্ত্রে'র সর্বশেষ পরিচ্ছেদে আছে যে, আলোচ্য বিষয়ের অবশিষ্টাংশ কোহল কর্তৃক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক অনেক লেখকের মতে, উপরূপকের আলোচনার সূত্রপাত করেন কোহল। কোহল ভরতপুত্র বলে প্রসিদ্ধি আছে।[১]

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ভরতের মূল গ্রন্থ ও বর্তমান রূপের অন্তবর্তী কালে কোহল এবং অপর কতক প্রামাণ্য লেখকের মতবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং ভরতের গ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।

একটি ঐতিহ্য এই যে, ভরতের আদিগ্রন্থ ছিল সূত্রাকারে রচিত। ভবভূতি ভরতকে 'তৌর্যত্রিক সূত্রকার' (উত্তররামচরিত ৪.২২, নির্ণয়সাগর, ১৯০৬, পৃঃ ১২০) রূপে অভিহিত করে ঐ ঐতিহ্য সমর্থন করেছেন। অভিনবগুপ্ত 'নাট্য-শাস্ত্রে'র টীকার প্রারম্ভে একে 'ভরতসূত্র' বলেছেন। 'নাট্যশাস্ত্রে'র বর্তমান রূপে রস ও ভাবের আলোচনায় (অধ্যায় ৬, ৭) এই ঐতিহ্যের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রসসূত্রটি সূত্রাকৃতি। এরই ব্যাখ্যায় ভাষ্য বা বৃত্তি আকারে অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ রচিত হয়েছে। অষ্টবিংশ থেকে একত্রিংশ পর্যন্ত অধ্যায়গুলিতে সূত্র-ভাষ্য আকারের রচনার কিছু নিদর্শন আছে; যথা—আতোদ্যবিধিম্ ইদানীং বক্ষ্যামঃ (২৮.১)।

আদিভরত[২]

'নাট্যশাস্ত্রে'র রচনার আলোচনায় আদিভরত সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

১। দ্র. নাট্যশাস্ত্র ১.২৬ (চৌখাম্বা, ১৯২৯)।

২। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য S. K. De, The Problem of Bharata and Adibharata, 'Our Heritage' (কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা), I; S. K. De, Some Problems of Sanskrit Poetics.

এই শব্দ দুইটি গ্রন্থনাম এবং গ্রন্থকারনাম হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'র রাঘবভট্টকৃত 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকায় (খ্রীঃ ১৫শ-১৬শ শতক) 'আদিভরত' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি আছে। 'আদিভরত' নামক একখানি পুঁথি মহীশূর ওরিয়েন্ট্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

উল্লিখিত টীকায় অন্তত উনিশটি উদ্ধৃতি 'আদিভরত' থেকে আছে। এগুলির মধ্যে বারটি ভরতের বর্তমান 'নাট্যশাস্ত্রে' পাওয়া যায়।

উক্ত পুঁথিটি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, এটি 'ভরতনাট্যশাস্ত্র' ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাঘবভট্টের সাক্ষ্য থেকে মনে করা যেতে পারে যে, ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ছাড়াও আদিভরত নামক কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকার তাঁর জানা ছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্ট্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্-এ 'নাট্যসর্বস্বদীপিকা' নামক একখানি পুঁথিতে 'আদিভরত' গ্রন্থের অংশবিশেষ আছে বলে মনে হয়। এই পুঁথিখানি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, এটি দুই ব্যক্তির রচনা। 'আদিভরত' অংশের 'নাট্যসর্বস্বদীপিকা' নামক টীকা আছে। 'আদিভরতে'র রচয়িতা নারায়ণ বা নারায়ণার্য ; ইনি রামানন্দ সিদ্ধশিবযোগিরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়।

এই গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, ভরতশাস্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ ছিল। এদের রচয়িতৃগণের মধ্যে মূল ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ছিলেন ভরত, যিনি উমাপতি (শিব) নামেও পরিচিত। নৃত্ত আদিভরতের প্রমাণভিত্তিক।

রাঘবভট্টের উল্লিখিত টীকায় 'আদিভরত' থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি বর্তমান 'নাট্যশাস্ত্রে' পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশই রূপক সংক্রান্ত। কিন্তু, পুঁথিতে যে 'আদিভরত' আছে তা নৃত্তবিষয়ক। সুতরাং, মনে হয়, রাঘবভট্টের 'আদিভরত' অনেকাংশে বর্তমান 'নাট্যশাস্ত্রে'র অনুরূপ এবং উক্ত পুঁথির 'আদিভরত' থেকে স্বতন্ত্র। তবে, রাঘবভট্টের উদ্ধৃতির চারটি পংক্তি এই 'আদিভরতে' হুবহু আছে।

'নাট্যশাস্ত্রে'র ভূমিকায় (গাইকোয়াড্ সং ১, পৃঃ ৫) রামকৃষ্ণ কবি জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে 'সদাশিবভরত' নামক একখানি গ্রন্থের অংশবিশেষ আছে। অন্যত্র (Jour. of Andhra H. R. S., ৩, পৃঃ ২৩) ১২০০০ শ্লোক সম্বলিত 'বৃদ্ধভরত' নামক গ্রন্থের নামোল্লেখ তিনি করেছেন।

সমস্ত তথ্য পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রাঘব-

ভট্টের মতে 'আদিভরত' ভরতের বর্ত্তমান 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে স্বতন্ত্র। উক্ত পুঁথির 'আদিভরত' যেহেতু প্রধানত নৃত্ত এবং সঙ্গীত বিষয়ক, সেই কারণে এটি রাঘবভট্টের 'আদিভরতে'র সঙ্গে অভিন্ন নয়। উক্ত পুঁথির 'আদিভরত' সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের একখানি পরবর্তী যুগের গ্রন্থ।

পি. ভি. কানে মহাশয় বলেছেন[১] যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের লেখকগণ ভরত এবং আদিভরতের মধ্যে প্রভেদ করেছেন। ভরত বা ভরতশাস্ত্র শব্দে ক্রমে নাট্য, নৃত্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহকে বোঝাত। এমন হতে পারে যে, এই সমস্ত অর্বাচীন গ্রন্থকার বা গ্রন্থ থেকে ভরতমুনির গ্রন্থকে বিশেষিত করার উদ্দেশ্যে আদি বা বৃদ্ধ শব্দ প্রযুক্ত হত। সারদাতনয় (খ্রীঃ ১২শ-১৩শ শতক) 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে ভরতবৃদ্ধ এবং ভরতের পৃথক উল্লেখ করেছেন।

নাট্যশাস্ত্রের কাল

'নাট্যশাস্ত্রে'র রচয়িতা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, এই গ্রন্থ এককালের রচনা নয়; সম্ভবত সংযোজন পরিবর্তনাদির ফল এই গ্রন্থের বর্তমান রূপ। এর আদি রূপ সূত্রাকারে[২] ছিল কিনা জানা নেই। যে আকারেই থেকে থাক, আদি রূপের রচনাকাল অজ্ঞাত এবং সম্ভবত অজ্ঞেয়।

মোটামুটিভাবে বর্তমান রূপটির উদ্ভবকালের নিম্নতর সীমারেখা খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগ। প্রায় এই কালের আলংকারিক উদ্ভট 'নাট্যশাস্ত্রে'র ৬.১৫ শ্লোকটির প্রথমার্ধ স্বীয় গ্রন্থে (৪.৪) উদ্ধৃত করেছেন এবং দ্বিতীয়ার্ধে এমন ভাবে শব্দ পরিবর্তন করেছেন যাতে ভরতের অষ্টরসের সঙ্গে নবম রস হিসাবে যুক্ত হতে পারে শান্ত। 'নাট্যশাস্ত্রে'র ৬.১০ শ্লোকের প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্তের মন্তব্য থেকে মনে হয়, বর্তমান রূপের গ্রন্থটির সঙ্গে উদ্ভটের পরিচয় ছিল। শার্ঙ্গদেবের সাক্ষ্য অনুসারে (সঙ্গীতরত্নাকর ১. ১. ১৯) উদ্ভট 'নাট্যশাস্ত্রে'র অন্যতম ব্যাখ্যাতা। অভিনবগুপ্ত (১০ম শতক-শেষভাগ) 'নাট্যশাস্ত্রে'র যে সকল ব্যাখ্যাতার নামোল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে লোল্লট ও শংকুক সম্ভবত খ্রীস্টীয় অষ্টম ও নবম শতকের লেখক।

'নাট্যশাস্ত্রে'র রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে টানা গেলেও উর্ধ্বতন সীমা নির্ণয় দুরূহ। এই গ্রন্থের যে অংশে প্রধানত সঙ্গীতের আলোচনা আছে সেই অংশ আভ্যন্তরীণ কতক প্রমাণবলে কোন কোন পণ্ডিত খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। অন্যান্য অংশগুলিও সমকালীন হতে পারে।

'নাট্যশাস্ত্রে'র আদি সারাংশটুকু বোধহয় ভামহের দীর্ঘকাল পূর্বে রচিত হয়েছিল। কাব্যালংকারের আলোচনা প্রসঙ্গে ভামহ (৭ম শতকের তৃতীয় পাদ থেকে অষ্টম শতকের শেষ পাদের মধ্যে) বলেছেন যে, আদিতে মাত্র পাঁচটি অলংকার (২. ৪) স্বীকৃত হত। এগুলি হল অনুপ্রাস, যমক, রূপক, দীপক ও উপমা। কালক্রমে অলংকার-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বহু। 'নাট্যশাস্ত্রে' (১৫.৪১) চারটি অলংকারের নাম আছে; যথা—যমক, রূপক, দীপক ও উপমা। এই চারটি ও উল্লিখিত পাঁচটি একই প্রকার; কারণ, অনুপ্রাসকে যমকেরই অন্তর্গত বলা যায়। বর্ণাবৃত্তি অনুপ্রাস, বর্ণসমষ্টির আবৃত্তি যমক। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ভরত ছিলেন সেই যুগের যখন অলংকার সংখ্যা ছিল মাত্র চার বা পাঁচ। ভরতের যুগ থেকে ভামহের কাল পর্যন্ত দীর্ঘকালের ব্যবধান ছিল বলে মনে হয়; কারণ ভামহের কালে অলংকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল চল্লিশ।

ভরত ও তদীয় 'নাট্যশাস্ত্র'কে কালিদাসের (আঃ পঞ্চম শতক; নিম্নতর সীমারেখা ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দ) পূর্ববর্তী বলে মনে করার কারণ আছে। 'বিক্রমোর্বশীয়ে' (২.১৮) 'নাট্যচার্য' রূপে ভরতের উল্লেখ আছে। 'রঘুবংশে' (১৯.৩৬) আছে 'অঙ্গসত্ত্বচনাশ্রয় নৃত্য'। এই কথাটি ভরতের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়: সামান্যাভিনয়ো নাম জ্ঞেয়ো বাগঙ্গসত্ত্বজঃ। 'কুমারসম্ভবে' (৭.৯১) 'সন্ধি' ও 'ললিতাঙ্গহারে'র উল্লেখ আছে; 'নাট্যশাস্ত্রে'র ২০.১৭ (চৌখাম্বা ২২.১৭) তে এ-বিষয়ের আলোচনা আছে।

উল্লিখিত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যদিও বর্তমান রূপের 'নাট্যশাস্ত্র' খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে প্রচলিত ছিল, তাহলেও ভরতের কালের নিম্ন-সীমারেখা সম্ভবত চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে টানা যায়। উর্ধ্বতন সীমা সম্ভবত অতি প্রাচীনকালে হবে না; কারণ, এই গ্রন্থে শক, যবন, পহ্লব এবং অন্যান্য উপজাতির উল্লেখ আছে। সুতরাং, উর্ধ্বতন সীমা খ্রীস্ট জন্মের কাছাকাছি সময়ে স্থাপিত হতে পারে। অবশ্য এরূপ একটি বিমিশ্র (composite) গ্রন্থে উল্লিখিত উপজাতিসমূহের উল্লেখ কোন সংশয়াতীত ইঙ্গিত বহন করে না।

'নাট্যশাস্ত্রে'র পুঁথিসমূহ পরীক্ষা করলে দেখা যায়, এই গ্রন্থের দুইটি রূপ ছিল। একটি হ্রস্ব, অপরটি দীর্ঘ। এই দুই রূপের তুলনা করলে মনে হয়, দীর্ঘরূপটি প্রাচীনতর ; কারণ—

(১) হ্রস্ব রূপের ১৪শ-১৫শ অধ্যায়ে ছন্দের আলোচনায় পিঙ্গলের ব্যবহৃত রে. জ প্রভৃতি সংকেত প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ রূপে প্রাচীনতর লঘু, গুরু প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) হ্রস্ব রূপের ১৫শ অধ্যায়ে উপজাতি ছন্দে ছন্দের লক্ষণ আছে। দীর্ঘ রূপের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে (১৪) শ্লোক বা অনুষ্টুপ্ ছন্দে এবং ভিন্নক্রমে লক্ষণ দেওয়া আছে। 'নাট্যশাস্ত্রে'র অধিকাংশ এই ছন্দে রচিত বলে দীর্ঘ রূপটিই প্রাচীনতর বলে মনে হয়। হ্রস্ব রূপের ১৬শ অধ্যায়ের প্রারম্ভিক শ্লোকগুলি উপজাতি ছন্দে রচিত ; কিন্তু দীর্ঘ রূপে ঐগুলি শ্লোক ছন্দে রচিত।

(৩) দীর্ঘ রূপে নাট্যগুণ ও অলংকার সম্বন্ধে শ্লোকগুলিতে (১৭) 'নাট্যশাস্ত্রে'র সরল ভাষা প্রযুক্ত হয়েছে ; কিন্তু হ্রস্ব রূপের সংশ্লিষ্ট অংশের ভাষাতে পরবর্তীকালের মার্জিত রূপ লক্ষণীয়।

যাঁরা প্রাচীনতর যুগে এই গ্রন্থের উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করেন, তাঁদের প্রধান যুক্তিগুলি নিম্নলিখিতরূপ।

নাট্যশাস্ত্রের ভাষায় কিছু অপাণিনীয় প্রয়োগ আছে ; যথা গৃহীত্বা স্থলে গৃহ্য, ছাদয়িত্বা স্থলে ছাদ্য। এর থেকে মনে করা যায় যে, এই গ্রন্থ পাণিনির দীর্ঘকাল পরে রচিত হয় নি। পাণিনির কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সাধারণত তাঁকে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের লেখক বলে মনে করা হয়। নাট্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা পর্যালোচনা করেও প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মাগধী, আবন্তী, প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীক, দাক্ষিণাত্যা — প্রাকৃতের এই সকল উপভাষা (dialect) অতি প্রাচীনকালেই লুপ্ত হয়েছিল, অথচ এগুলি প্রয়োগের নির্দেশ নাট্যশাস্ত্রে আছে।

অশোকের লিপিসমূহের তুলনায় নাট্যশাস্ত্রে প্রযুক্ত প্রাকৃত অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর। অশোকলিপিতে সংস্কৃতের অব হয় ও, ঘ হয় হ। নাট্যশাস্ত্রে অব এবং ও এই দুই প্রকার প্রয়োগই আছে ; যথা উপবহন, উপোহন (৪.২৭৭, ৩১.১৪০-৪৯, ২৪৮-৪৯, ২৫৪, ২৫৫, ২৬৫ প্রভৃতি)। এর থেকে মনে হয়, নাট্যশাস্ত্রের ভাষা প্রাচীনতর। নাট্যশাস্ত্রে পদমধ্যস্থ ঘ হ হয়ে যাওয়ার

কোন লক্ষণ দেখা যায় না। মনে হয়, অশোকলিপিতে লক্ষিত এই বৈশিষ্ট্য নাট্যশাস্ত্রের তুলনায় পরবর্তী কালের।

ধ্রুবাগুলির প্রাকৃত (৩২) সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নাট্যশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পাঠপ্রণালীতে ধ্রুবাস্থ প্রাকৃতের আকার, য্যাকবির (Jacobi) মতে ৩০০ খ্রীস্টাব্দের ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু, অশ্বঘোষের (আঃ ১০০ খ্রীস্টাব্দ) প্রাকৃতের লক্ষণ প্রাচীনতর। তাছাড়া, নাট্যশাস্ত্রের বর্ধিত রূপে ধ্রুবার প্রাকৃত কালিদাসের (আঃ ৪০০ খ্রীস্টাব্দ) সমসাময়িক।

মনোমোহন ঘোষ মহাশয় মনে করেন, এই উভয় রূপেই প্রাকৃতের আদি বর্ণবিন্যাস রক্ষিত হয় নি।

নাট্যশাস্ত্রে প্রযুক্ত ছন্দের বিশ্লেষণে দেখা যায়, এগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে সন্ধি নেই এবং বর্ণদ্বয়ের মধ্যে এমন ব্যবধান আছে যা ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না।[1] এই সব লক্ষণ বৈদিক। সুতরাং, মনে করা যেতে পারে যে, ছন্দে বৈদিকলক্ষণ অপ্রচলিত হওয়ার পূর্বেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী কাল পর্যন্ত এই লক্ষণ বিদ্যমান ছিল।

পিঙ্গলছন্দসূত্রে ছন্দসংখ্যা নাট্যশাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর। সুতরাং, মনে হয় পিঙ্গল (খ্রীস্টপূর্ব ২য় শতক) পরবর্তী লেখক। পিঙ্গলের কতক পারিভাষিক শব্দ নাট্যশাস্ত্র অপেক্ষা পরবর্তীকালের।

মহাভাষ্যে (আঃ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে যে সকল ছন্দের প্রয়োগ আছে ঐগুলির সবই নাট্যশাস্ত্রে আছে। সুতরাং ধরা যায়, পতঞ্জলি যে সকল গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন সেই সকল গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রের ছন্দমান অনুসৃত হয়েছে। অতএব মনে হয়, নাট্যশাস্ত্র ২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পরবর্তী হতে পারে না।

এই গ্রন্থে যে সকল অলংকারের উল্লেখ আছে ঐগুলি বিচার করলে দেখা যায়, গ্রন্থখানি অশ্বঘোষের (আঃ ১০০ খ্রীস্টাব্দের নিকটবর্তী) পূর্ববর্তী। অশ্বঘোষ উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে এই অলংকারের উল্লেখ নেই। ভাস সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

দেবতত্ত্ববিষয়ক (mythology) কতক ব্যাপারে রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের সাদৃশ্য আছে। আদিমরূপের রামায়ণের কাল ৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের

১। যথা পুণ্ড্রাঙ্কং......চ অসিতং......। ১. ৩৬

অত্যায়তপদন্যাচ্চ অঙ্গহাস্তো ভবেৎসতু। ১৩. ১৪০

পরবর্তী নয়। আদিরূপের মহাভারত খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে প্রচলিত ছিল। সুতরাং ৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী কালে নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়েছিল বলে মনে হতে পারে।

রামায়ণের নির্ভরযোগ্য সংস্করণে (যথা Gorrersর সংস্করণ) নাট্যশাস্ত্র-বহির্ভূত ছন্দ একটি আছে। সুতরাং শেষোক্ত গ্রন্থ পূর্ববর্তী। ভাসের গ্রন্থে দুইটি ও অশ্বঘোষের গ্রন্থে পাঁচটি অতিরিক্ত ছন্দ প্রযুক্ত হওয়ায় ইঁহারা নাট্য-শাস্ত্রের পরবর্তী লেখক ছিলেন বলে মনে হয়।

নাট্যশাস্ত্রে অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে গ্রন্থকারের উপজীব্য বৃহস্পতি, কৌটিল্য নন। কিন্তু, নাট্যশাস্ত্রে প্রযুক্ত দ্বাস্থ (৩৪.৭৩), কুমারাধিকৃত (৩৪.৯৫-৯৭) কৌটিল্যের দৌবারিক ও কুমারাধ্যক্ষের অনুরূপ। এর থেকে মনে হয়, বৃহস্পতি বা অন্য কোন পূর্ববর্তী আচার্য থেকে নাট্যশাস্ত্ররচয়িতা বা সংকলয়িতা এই দুইটি সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। পরে এই দুই শব্দের অর্থ সহজবোধ্য করার জন্য কৌটিল্য একটু পরিবর্তিত আকারে শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং মনে হয়, নাট্যশাস্ত্র কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের (খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আদিভাগ) পূর্ববর্তী অথবা সমকালীন।

নাট্যশাস্ত্রে প্রযুক্ত কতক শব্দ শুধু এই গ্রন্থেই আছে ; যথা কথনী (২৫.৯ কথক অর্থে), দিবৌকস (১.৮৪ মেঘ বোঝাতে), প্রেষণিকা (১৪.১৬ পরিচারিকা)। এমন শব্দও আছে যেগুলি প্রায়ই প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, যথা সভান্তর (৩৪.৬১ সভাসদ), মহাভারত ৪.১.২৪, মহত্তরী (৩৪.৬১— বর্ষীয়সী মহিলা)।

নাট্যশাস্ত্রে (১৪, ১৮, ২৩) ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল, পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের নানা স্থানের উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের সময় ছাড়া ভারত এমন একটি সংহত রাজ্য বা সাম্রাজ্য ছিল না। মনে করা যেতে পারে, নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল মৌর্যশাসনকালে। নাট্যশাস্ত্রে লিখিত তোসল সম্ভবত অশোকের তোসলি। এই নাম পরবর্তীকালে লুপ্ত হয়েছিল। সুতরাং এই তথ্য সম্ভবত উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল।

ভাস অবিমারকে (দেবধরের সংস্করণ, ২) নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়াও নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের প্রমাণ আছে। সুতরাং, নাট্যশাস্ত্র ভাসের পূর্ববর্তী।

ভাসের গ্রন্থাবলীতে প্রযুক্ত প্রস্তাবনা, সূত্রধার, রঙ্গ প্রভৃতি পারিভাষিক

শব্দ নাট্যশাস্ত্রেরও আছে। চারুদত্তে (১.২৬.৩৮) অন্তঃপুরে গণিকার নিষিদ্ধ প্রবেশ নাট্যশাস্ত্রের (২০.৫৪) শ্লোক স্মরণ করিয়ে দেয়। চারুদত্তে নৃত্তোপদেশ-বিশদচরণৌ ত অভিনয়তি বচাংসি সর্বগাত্রৈঃ প্রভৃতি কথা (১.৯.০,১৬.০) নাট্যশাস্ত্রের নৃত্ত ও অঙ্গভঙ্গীসংক্রান্ত আলোচনা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব মনে হয়, নাট্যশাস্ত্র ভাসের পূর্ববর্তী।

এই শাস্ত্রে প্রযুক্ত দ্রমিল শব্দটি (১৩.৪৩) তমিল বা তামিল শব্দের প্রাচীন রূপ। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, এই রূপ প্রচলিত ছিল খ্রীস্টীয় শতকের প্রারম্ভিক যুগে (দ্রঃ সুনীতি চ্যাটার্জি, O D B L)।

নাট্যশাস্ত্রের পহ্লব (২১.৮৯) শব্দে বোঝায় পহ্লব। এই শব্দে সূচিত হয় সেই পার্থিয়ানগণ যাদের উত্তরপশ্চিম ভারতে ২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী সময়ে রাজনৈতিক প্রভাব ছিল।

এই গ্রন্থে কৃষ্ণের উল্লেখ নেই, যদিও বলরামের উল্লেখ আছে (যথা ৪.২৬১, ৩২.৩২০)। হয়ত সে যুগে কৃষ্ণের নাম জানা থাকলেও বাসুদেব নামটির প্রয়োগ ছিল ব্যাপকতর। এর থেকে নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব অনুমেয়।

উল্লিখিত যুক্তিসমূহ বিচার করলে অনেক যুক্তিরই ত্রুটি লক্ষিত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে অপাণিনীয় শব্দের প্রয়োগ সামগ্রিকভাবে গ্রন্থখানির কাল নির্দেশ করে না। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই গ্রন্থে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশের সংযোজন আছে। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট অংশটি অতি প্রাচীন হলেও সমগ্র গ্রন্থখানি তা নাও হতে পারে। প্রাকৃত ভাষাভিত্তিক যুক্তিও একই কারণে অবি-সংবাদিত বলা যায় না।

এই গ্রন্থে বৈদিক লক্ষণাক্রান্ত ছন্দ সংশ্লিষ্ট অংশের অতিপ্রাচীনত্ব সূচিত করলেও সমগ্র গ্রন্থের কাল নির্দেশ করে না। তাছাড়া যে বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভর করে নাট্যশাস্ত্রের কতক ছন্দে বৈদিকলক্ষণের কথা বলা হয়েছে তা রচয়িতার অনবধানতাবশত অথবা ছন্দরক্ষার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হতে পারে।

মহাভাষ্যে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের ছন্দের প্রমাণ অনুসারে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না। মাত্র তেরটি ছন্দে নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণ আছে বলেই এই-গুলিতে নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয় না।

রামায়ণে একটিমাত্র অতিরিক্ত ছন্দ থাকায় এই গ্রন্থকে নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তী বলা যায় না। তা ছাড়া, রামায়ণের বর্তমান রূপের কাল আধুনিক অনেক

পণ্ডিতের মতে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক। রামায়ণের আদিরূপে এই ছন্দ ছিল কিনা বলা যায় না।

ভাসের গ্রন্থে অতিরিক্ত ছন্দ থেকে তাঁকে নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তী মনে হতে পারে। কিন্তু, ভাসের কাল অনিশ্চিত। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে খ্রীস্টীয় শতক পর্যন্ত নানা সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ ভাসকে স্থাপন করেছেন। একই কারণে ভাসের গ্রন্থে প্রযুক্ত অলংকারের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের তুলনার ভিত্তিতে উপস্থাপিত যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ। এই দুই এপিকের আদি রূপ ঠিক কিরূপ ছিল তা জানা নেই। সুতরাং, এই যুক্তি নিতান্তই অনুমানমূলক। ভিণ্টারনিৎস্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে, মহাভারতের বর্তমান রূপের রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা আনুমানিক খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক এবং বর্তমান রূপের রামায়ণ সম্ভবত উদ্ভূত হয়েছিল বর্তমান মহাভারতের এক কি দুই শতক পূর্বে। বর্তমান রূপের এই দুই এপিকের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের কোন সাদৃশ্য থাকলে তা শেষোক্ত গ্রন্থের উদ্ভবকাল খ্রীস্টপূর্ব যুগে সূচিত করে না।

কামসূত্র ও নাট্যশাস্ত্রের পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নয়। কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন কারও মতে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের লেখক। কিন্তু অপর পণ্ডিতগণ তাঁকে খ্রীস্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত নানা সময়ে স্থাপন করেন।

বৃহস্পতির উল্লেখ থেকে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। কানের আলোচনা থেকে জানা যায় (History of Dharmasastra, I, pt. 1, revised, পৃঃ ২৮৭-৯০) যে, একাধিক ব্যক্তির নাম ছিল বৃহস্পতি। কৌটিল্য এক বৃহস্পতির উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু, বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্র নামক একখানি গ্রন্থ পরবর্তী কালের। নাট্যশাস্ত্রে যে অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ আছে তা কোন্ বৃহস্পতি রচিত জানা নেই।

ভৌগোলিক তথ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত যুক্তি ত্রুটিহীন নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানাস্থানের উল্লেখ থেকে একটি সাম্রাজ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সাম্রাজ্য স্থাপিত না হলেও নানাস্থানের নামোল্লেখে কোন বাধা থাকতে পারে না।

ভাসের 'অবিমারকে' নাট্যশাস্ত্র শব্দটি ভরতের গ্রন্থকে সূচিত নাও করতে পারে। সাধারণভাবে নাট্যকলাবিষয়ক শাস্ত্র গ্রন্থকারের অভিপ্রেত হতে

পারে। ভরত নিজেই বহু পূর্ববর্তী লেখকের নামোল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, উক্ত নাট্যশাস্ত্র শব্দটি প্রক্ষিপ্তও হতে পারে।

ভাসের গ্রন্থে প্রযুক্ত কতক পারিভাষিক শব্দ ও নৃত্যাদিবিষয়ের কতক উল্লেখ 'নাট্যশাস্ত্রে' আলোচিত বিষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপার আকস্মিক হতে পারে। ভাস প্রাচীনতর কোন গ্রন্থ অনুসরণ করে থাকতে পারেন। তা ছাড়া, 'নাট্যশাস্ত্রে'র সঙ্গে ভাসের গ্রন্থাবলীর তুলনায় বৈসাদৃশ্যও আছে। ভাসের নাটক 'সূত্রধারকৃতারম্ভ'; কিন্তু 'নাট্যশাস্ত্র' অনুসারে (৫.১৬৭) এ কাজ স্থাপকের। রঙ্গমঞ্চে মৃত্যু অভিনীত হবে না 'নাট্যশাস্ত্রে'র এই নির্দেশ (২০.২০) ভাস মানেন নি; তাঁর 'অভিষেক' নাটকের প্রথম অংকে মৃত্যুর দৃশ্য আছে। 'নাট্যশাস্ত্র' অনুসারে (২৩.৯১) বরুণের বর্ণ হবে শুভ্র, কিন্তু 'অভিষেক' নাটকে (৪.১৫) বরুণ নীলবর্ণ।

'নাট্যশাস্ত্র'কে ভাসের পূর্ববর্তী মনে করলেও এই গ্রন্থের কাল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না; কারণ, পূর্বে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, ভাসের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতে শত শত বৎসরের ব্যবধান রয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা

'নাট্যশাস্ত্রে'র অভিনবগুপ্ত (আঃ দশম শতকের শেষ পাদ ও একাদশ শতকের প্রথম পাদ) রচিত অভিনব ভারতী নামক একমাত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আরও অনেক ব্যাখ্যাকারের সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু, মহাকালের বিচারে তাঁদের গ্রন্থ রক্ষণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। এর থেকে অভিনবগুপ্তের গ্রন্থের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা অনুমিত হয়। রস সম্বন্ধে এই অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদই পণ্ডিতসমাজে সবিশেষ আদৃত হয়ে পরবর্তী অলংকার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা সহকারে গৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

'সঙ্গীতরত্নাকর'[1] রচয়িতা শার্ঙ্গদেব এবং অন্যান্য কতক লেখকের সাক্ষ্য থেকে 'নাট্যশাস্ত্রে'র নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাতাগণের নাম জানা যায় : মাতৃগুপ্তাচার্য, উদ্ভট (আঃ ৭ম শতক) লোল্লট (আঃ ৮ম শতক) শংকুক,[১] ভট্টনায়ক, (আঃ ৯ম শতকের শেষ ও ১০ম শতকের প্রারম্ভ কাল মধ্যে রচিত) হর্ষ, কার্তিধর, নান্যদেব।

অভিনবগুপ্ত অপর ব্যাখাতাদের নামোল্লেখও করেছেন ; যথা—ভট্টযন্ত্র, প্রিয়াতিথি, ভট্টবৃদ্ধি, ভট্টসুমনস্, ভট্টগোপাল, ভট্টশংকর, ঘণ্টক। রাহুল বা রাহুলের নাম অভিনব ও শার্ঙ্গধর উভয়েই উল্লেখ করেছেন।

জগন্নাথ 'রসগঙ্গাধরে' রসসূত্রের আট প্রকার ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন।

নাট্যশাস্ত্রের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু[২]

বর্তমান 'নাট্যশাস্ত্র' এই গ্রন্থের আদিরূপ নয়, আধুনিক পণ্ডিতগণের এই মত। 'নাট্যশাস্ত্রে'র রয়চিতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এর আদিরূপ সূত্রাকারে রচিত হয়েছিল বলে একটি ঐতিহ্য আছে।

বর্তমান রূপের 'নাট্যশাস্ত্রে' অধ্যায়সংখ্যা ৩৬, মতান্তরে ৩৭। অভিনবগুপ্তের সাক্ষ্য অনুসারে এতে ৩৬টি অধ্যায়ে ৬০০০ শ্লোক আছে। 'নাট্যশাস্ত্রে'র রচয়িতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থের অংশ বিশেষে সূত্রাকারের রচনা লক্ষিত হয়। গ্রন্থের স্থানে স্থানে আছে টুক্‌রো টুক্‌রো এমন গদ্যাংশ যা শ্লোকের ব্যাখ্যা নয়। তা ছাড়া আর্যা ও অনুষ্টুভ্ ছন্দে অনুবংশ্য বা পরম্পরাগত শ্লোক আছে। সূত্র-ভাষ্য জাতীয় কিছু রচনা এবং প্রণালীবদ্ধরূপে কারিকাও রয়েছে।

গ্রন্থের নাম 'নাট্যশাস্ত্র' হলেও এতে নৃত্য[৩]গীত এবং বাদ্যও আলোচিত হয়েছে। নাট্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ছাড়াও রঙ্গালয় সংক্রান্ত বহু বিধিনিষেধ এতে আছে।

---

১. সম্ভবত কাশ্মীরের রাজা অজিতাপীড়ের (আঃ ৮১৩ বা ৮১৬ খ্রীস্টাব্দ) সময়ে রচিত 'ভুবনাভ্যুদয়' কাব্যের রচয়িতার সঙ্গে অভিন্ন।

২. যদিও পরে অধ্যায় অনুসারে বিষয়বস্তুর সারসংকলন লিখিত হয়েছে, তথাপি প্রধান কয়েকটি বিষয়ের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হল।

৩. শাস্ত্রে নৃত্ত শব্দ থাকলেও, নৃত্য শব্দ প্রচলিত বলে লিখিত হল ; নৃত্ত ও নৃত্যের প্রভেদ পরে আলোচিত হয়েছে।

নাট্যের স্বরূপ ও অভিনয়ের প্রকারভেদ

নাট্যের[১] স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এটি 'অবস্থানুকৃতি'। এই অনুকৃতি বা অনুকরণ হতে পারে চারভাবে ; যথা—অঙ্গভঙ্গীদ্বারা, বাক্যদ্বারা, বেশভূষা-দ্বারা এবং রোমাঞ্চ স্বেদোদম প্রভৃতি দ্বারা। এইপ্রকার অভিনয় পদ্ধতিগুলিকে বলা হয়েছে যথাক্রমে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।

চতুর্বিধ অভিনয় ছাড়াও সামান্যাভিনয় ও চিত্রাভিনয় বর্ণিত হয়েছে। কালক্রমে অভিনয় সম্বন্ধে কতক রীতির সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল এবং এইগুলি অভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আঙ্গিকাভিনয়ে শাখা, নৃত্য, অংকুর এই তিনটি ব্যাপার ছিল। কিন্তু সামান্যাভিনয়ে ছয়টি ব্যাপার ছিল : বাক্যাভিনয়, সূচা, অংকুর, শাখা, নাট্যায়িত ও নিবৃত্ত্যংকুর।

বিবিধ ভাবের অভিনয়কে বলা হয়েছে চিত্রাভিনয়। যা বলা হয় নি তাকে নানাভাবে প্রকাশ করা হয় এই অভিনয়ে। যেমন রোমাঞ্চ দ্বারা কোমল বা প্রিয়দ্রব্যের স্পর্শ অভিনয়। আবার কর্কশ বা অপ্রিয়দ্রব্যের পরিহারসূচক স্পর্শ বর্জন। গাত্রকম্প বা নেত্রানিমীলন দ্বারা বিদ্যুৎপাতের অভিনয়। 'নাট্যশাস্ত্রে' (২২.৭৫-৮০) আবার অভিনয় দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে ; অভ্যন্তর ও বাহ্য। যা গতানুগতিক তা আভ্যন্তর, যা বাঁধাধরা নিয়ম মানে না তাকে বলে বাহ্য। আভ্যন্তরে শারীরক্রিয়া প্রচণ্ড ব্যস্ত ও জটিল হয় না। শরীর সঞ্চালন তাল লয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে কথাগুলি স্পষ্ট ও অকর্কশ হয়। বাহ্য এর বিপরীত ; এতে গতিবিধি হয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং সঙ্গীতবর্জিত। যারা নিয়মিত শাস্ত্রচর্চা করে নি তারা বাহ্যাভিনয় করে।

অভিনয় পুনরায় ত্রিবিধ—অনুরূপ (এতে পুরুষ পুরুষের ও নারী নারীর ভূমিকা গ্রহণ করে), রূপানুরূপ (এতে পুরুষ নারীর ও নারী পুরুষের অংশ গ্রহণ করে), বিরূপ, (এতে অসদৃশ ব্যক্তির অভিনয় করা হয় ; যেমন শিশু বৃদ্ধের বা বৃদ্ধ শিশুর ভূমিকা গ্রহণ করে)। কাব্য ও নাট্যের প্রভেদ এই যে, কাব্য কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, নাট্যাভিনয় নেত্ররঞ্জকও বটে। দৃশ্য বলেই নাট্যকে বলা হয় রূপ বা রূপক ; এতে রূপের আরোপ করা হয়, যেমন নটে রামরূপের আরোপ।

---

১. নাটক শব্দটির পরিবর্তে নাট্য পদপ্রয়োগের কারণ এই যে, ইংরেজী drama মাত্রেই সংস্কৃতে নাটক নয়। বিভিন্ন প্রকার dramaর মধ্যে নাটক অন্যতম।

নাট্য, নৃত্ত, নৃত্য

নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্য—এই তিনটি পদের তাৎপর্য পৃথক্, যদিও এগুলি একই নৃৎ ধাতু নিষ্পন্ন। নৃত্ত শব্দে বোঝায় নাচ (dance); এটি তাললয়াশ্রিত। নৃত্য শব্দে বোঝায় অনুকরণাত্মক অঙ্গভঙ্গী (mime); এটি ভাবাশ্রয়। শেষোক্ত দুইটি গীত ও সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাট্যের সৃষ্টি করে। নাট্য রসাশ্রিত; এখানেই নৃত্ত ও নৃত্য অপেক্ষা এর স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষ।

নাট্যগ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ[১]

নাট্যগ্রন্থমাত্রেই রূপক নামে অভিহিত। রূপক দশবিধ; যথা—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবকার, বীথী, অংক ও ঈহামৃগ। এই ভেদগুলি বস্তু, নেতা ও রসের উপরে নির্ভর করে।

বস্তু

নাট্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু হতে পারে প্রখ্যাত, উৎপাদ্য বা কবিকল্পিত অথবা উভয়ের মিশ্ররূপ। বর্ণনীয় বিষয় দুভাগে বিভক্ত হবে; আধিকারিক বা মুখ্য ও প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক বৃত্ত হতে পারে পতাকা বা প্রকরী; প্রথমটি ব্যাপক ও দ্বিতীয়টি সীমিত।

নাটকীয় ঘটনাবলীর পরিণতি ঘটবে পাঁচটি অবস্থার ভিতর দিয়ে। এই অবস্থাগুলির নাম আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি, ফলাগম।

নাট্যবস্তুর পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি বা অঙ্গ থাকবে; অর্থপ্রকৃতিগুলির নাম বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য।

অবস্থা ও অর্থপ্রকৃতির ভিত্তিতে নাট্যবস্তুর সন্ধি পাঁচটি—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ, উপসংহৃতি।

নাট্যবস্তু অংকে বিভক্ত হবে; প্রতি অংকে একদিন নিষ্পাদ্য ঘটনা বর্ণিত হবে। নাট্যগ্রন্থের প্রকারভেদ অনুযায়ী অংকসংখ্যা নির্ধারিত হয়; নাটকের অংকসংখ্যা পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত হতে পারে। বিষ্কম্ভক, প্রবেশক প্রভৃতি অর্থোপক্ষেপকের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে নিষিদ্ধ ব্যাপারগুলি বর্ণিত হবে।

---

১. পরবর্তীকালে সাধারণত অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের উল্লেখ আছে। 'নাট্যশাস্ত্রে' নাটী বা নাটিকা ছাড়া অন্য উপরূপকের উল্লেখ নেই। 'সাহিত্য দর্পণে'র ষষ্ঠ অধ্যায়, নাটকলক্ষণ-রত্নকোশ ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

'পতাকাস্থানক' নামক একটি অবস্থা আসন্ন বা দূরবর্তী কোন ঘটনার সূচনা করা হবে।

নাট্যচরিত্র

সাধারণত নায়ক হবেন গুণবান্, যুবক, বুদ্ধিমান্, সুদর্শন, উত্তমী, নিপুণ, বিনীত। নায়কের কতকপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। সকলকেই হতে হবে ধীর, ললিত, শান্ত, উদাত্ত ও উদ্ধত।

নায়কের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন ব্যক্তি প্রতিনায়ক : তিনি ধীরোদ্ধত, অর্থগৃধ্নু, ব্যসনী, অপরাধপ্রবণ।

নায়কের সঙ্গে নায়িকার সম্পর্ক হতে পারে আশী প্রকার ; যেমন স্বাধীনপতিকা (পতি যাঁর বশীভূত), বাসকসজ্জিতা (সজ্জিতাবস্থায় প্রিয়ের জন্য প্রতীক্ষারতা), বিরহোৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা (পতিদেহে অন্য নারীর রমণচিহ্ন দর্শনে কুপিতা), কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা (প্রস্তাবিত মিলন স্থানে প্রিয়ের অনুপস্থিতিতে বঞ্চিতা), প্রোষিতপ্রিয়া, অভিসারিকা ইত্যাদি।

নায়িকাতে নানাপ্রকার হাবভাব থাকবে ; যেমন কিলকিঞ্চিত (ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, অশ্রু প্রভৃতির মিশ্রণজাত ভাব), মোট্টায়িত (প্রিয়ের সম্বন্ধে কথা শুনে বা প্রিয়ের প্রতিকৃতিদর্শনে স্নেহের অভিব্যক্তি), কুট্টমিত (কৃতককোপ), বিব্বোক (লোক দেখান ঔদাসীন্য) ইত্যাদি।

রাজার বিশ্বস্ত সখা বিদূষক। তিনি ব্রাহ্মণ এবং বেশভূষা, বাক্য ও ব্যবহারের দ্বারা হাস্য সৃষ্টি করেন।

কঞ্চুকী সংজ্ঞক ব্যক্তি বৃদ্ধ, গুণবান ব্রাহ্মণ ; তিনি অন্তঃপুরচারী।

বিটের চরিত্র কতক পরিমাণে গ্রীস দেশীয় প্যারাসাইটের অনুরূপ। তিনি কলাকুশল, সঙ্গীতজ্ঞ, গণিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ভাণ নামক রূপকে তাঁর উপস্থিতি অপরিহার্য।

স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে মহাদেবী বা প্রধানা মহিষীর স্থান সাতিশয় মর্যাদাপূর্ণ।

রস

ভরতের প্রসিদ্ধ রসসূত্রের আলোচনা পৃথকভাবে করা হয়েছে।

'নাট্যশাস্ত্র'মতে রস অষ্টবিধ—শৃঙ্গার , রৌদ্র, বীর, বীভৎস, হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক। ভরতের মতে কিন্তু প্রধান রস শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীভৎস ও হাস্য।

নাট্যগ্রন্থে সব রকম রসই থাকতে পারে, কিন্তু একটি হবে অঙ্গী বা প্রধান। নাটকে অঙ্গী রস শৃঙ্গার বা বীর।

বিভিন্ন প্রকার নাট্যগ্রন্থের লক্ষণ

'নাট্যশাস্ত্র' অনুসারে নাটক ও প্রকরণের প্রধান লক্ষণগুলি দেওয়া গেল ; অন্যপ্রকার নাট্যগ্রন্থগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক ও অপ্রচলিত।

নাটক

নাটকের বিষয় হবে প্রখ্যাত। নায়ক হবেন রাজা, রাজর্ষি, অথবা নরাকৃতি দেবতা। প্রধান রস হবে বীর বা শৃঙ্গার। এটি হবে মিলনান্তক ; বিয়োগান্তক বিষয় নিষিদ্ধ, কিন্তু এর কোন কারণ দেওয়া হয় নি। অংকসংখ্যা হবে পাঁচ থেকে দশ।

প্রকরণ

প্রকরণের বিষয়বস্তু লৌকিক কবিকল্পিত। নায়ক হবেন ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী বা বণিক্। তিনি হবেন দুরবস্থায় পতিত এবং ধন, প্রেমাদি লাভে যত্নবান। নায়িকা হতে পারেন গণিকা, কুলবধূ অথবা উভয়েই। এতে প্রধান রস শৃঙ্গার। অংকসংখ্যা এবং অন্যান্য বিষয় মোটামুটি নাটকের অনুরূপ।

২০.৫৯-৬২ শ্লোকে নাটী বা নাটিকার লক্ষণ লিখিত হয়েছে। এতে নাটক ও প্রকরণের লক্ষণ আংশিকভাবে বিদ্যমান। এর বৃত্ত হবে কল্পিত, নেতা রাজা। সঙ্গীত বা অন্তঃপুরস্থ ব্যাপার নিয়ে নাটিকা রচিত হবে। এতে থাকবে চার অংক ও প্রচুর নারীচরিত্র। এরূপ নাট্যগ্রন্থ হবে নৃত্যগীতবহুল ; প্রেমঘটিত বিষয় এর প্রধান উপজীব্য।

অভিনেতা

নাট্যাচার্য্যকে বলা হয়েছে সূত্রধার। তিনি হবেন সকল কলাভিজ্ঞ, সর্বদেশের রীতিনীতিজ্ঞ, নাট্যানুষ্ঠানে নিপুণ এবং নীতিনিষ্ঠ। তাঁর স্ত্রী হবেন একজন নটী; তিনি সূত্রধারকে প্রারম্ভিক দৃশ্যে সহায়তা করবেন।

স্থাপক সূত্রধারের অনুরূপ। সূত্রধার ও স্থাপক কোন কোন নাটকে এক-সঙ্গে থাকতেন কিনা জানা যায় না।

উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে অভিনেতাগণ ছিলেন ত্রিবিধ।

কি রকম লোকের কি প্রকার ভূমিকা হবে সেই সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। কোন ভূমিকাকে সেই পাত্রের যে লিঙ্গ ও বয়স ঠিক সেই লিঙ্গ ও বয়সের লোক অংশ গ্রহণ করতে পারে। বৃদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে যুবা; এর বিপরীতও হতে পারে। পুরুষের ভূমিকায় নারী অথবা নারীর ভূমিকায় পুরুষ অবতীর্ণ হতে পারে।[1]

অভিনেতার পোশাক সম্বন্ধে 'নাট্যশাস্ত্র' সতর্ক। প্রাসঙ্গিক রসের অনুকূল রং আবশ্যক। সাধারণত তাপসগণ পরেন ছিন্নবস্ত্র বা বল্কল। অন্তঃপুরবাসী ধিকৃত ব্যক্তি পরেন লাল পোশাক। রাজা পরেন সুদৃশ্য পরিচ্ছদ। আভীর কুমারীরা পরে গাঢ় নীল বস্ত্র। নোংরা পোশাক উন্মাদ, বৈলক্ষ্য, দৈন্য বা ভ্রমণের সূচক।

সংশ্লিষ্ট ভূমিকার উপযোগী রং পাত্র পাত্রী অঙ্গরাগ হিসাবে ব্যবহার করবেন।

অভিনেতাদের কেশবিন্যাস সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। পিশাচ, উন্মত্ত ব্যক্তি ও ভূতেরা আলুলায়িত কেশ ধারণ করবে। বিদূষকের হবে টাকমাথা। বালকদের মাথায় থাকবে তিন গোছা চুল। অবন্তির, বিশেষত বঙ্গদেশের, কুমারীরা মাথায় চক্রাকার পদার্থ ধারণ করত। উত্তরাঞ্চলের রমণীগণ মাথার উপরে উঁচু করে কেশবিন্যাস করতেন। অন্যান্য দেশের নারীগণ সাধারণত বেণী ধারণ করতেন।

অভিনেতার বেশ, আকৃতি ও চালচলন যাতে অভিনীত ভূমিকার উপযোগী হয় সেই সম্বন্ধে বিধান আছে। মাথা, চোখ, ভ্রূ, ঠোঁট প্রভৃতি অঙ্গের ভঙ্গীর উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হস্ত সঞ্চালনও প্রাধান্য লাভ করেছে।

---

১. আঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মহাভাষ্যে ভ্রূকুংস শব্দটি নারীর ভূমিকায় পুরুষকে বোঝায়।

সংশ্লিষ্ট চরিত্রের পদমর্যাদা ও কার্যকলাপ অনুযায়ী গতিভঙ্গীর উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে।

অভিনয়ের সহায়ক উপকরণ

'নাট্যশাস্ত্রে' অভিনয়ের সহায়ক কতক দ্রব্যের উল্লেখ আছে ; এইগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় পুস্ত। এইগুলি তিনরকম হতে পারে—(১) সন্ধিম—চামড়া বা কাপড়ে মোড়া বাঁশের তৈরি, (২) ব্যাজিম—যান্ত্রিক পদার্থ, (৩) বেষ্টিত—শুধু কাপড়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'উদয়নচরিতে' হাতি, 'মৃচ্ছকটিকে' মাটির গাড়ি, 'বালরামায়ণে' যন্ত্র-চালিত পুতুল ইত্যাদি। জন্তু-জানোয়ারের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ সজ্জীব নামে কথিত।

প্রতিশিরস্ বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন ভরত। এর অর্থ বোধ হয় মুকুট বা মুখোস। এইগুলি ত্রিবিধ—পার্শ্বাগত, মস্তকী, কিরীট। প্রথমটি ব্যবহৃত হবে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, পন্নগ ও রাক্ষসের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়টি মধ্যম দেবতা এবং তৃতীয়টি শ্রেষ্ঠ দেবতার জন্য বিহিত। নিকৃষ্ট দেবতার পক্ষেও এটি প্রযোজ্য। রাজার বেলা হবে মস্তকীর ব্যবহার। কেশমুকুট (যাতে কেশগুচ্ছ বাঁধা থাকে) বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণের ক্ষেত্রে হবে।

রাক্ষস ও দৈত্যের পক্ষে মুখোস প্রযোজ্য। যে সকল চরিত্রের দুইটি কি তিনটি মাথা দেখান হয় তখন মুখোস আবশ্যক।

নাট্যানুষ্ঠানকারিগণের দল

এই দলে থাকবে—সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক (সূত্রধার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণসম্পন্ন), তৌবিক (সর্ববাদ্যে নিপুণ), কুশীলব (বাদ্যযন্ত্রসমূহের স্থাপক এবং নিপুণ বাদক), নন্দী (সকল লোকের প্রশংসাকারী), নাট্যকার (বিভিন্ন ভূমিকার স্রষ্টা), ভরত (এর প্রেরণায় সকল ভূমিকার পাত্রগণ অংশগ্রহণ করত), নট, বিদূষক, নায়ক, নাটকীয়া (অতি সুন্দরী ও তাল লয়াদিতে নিপুণা)।

প্রেক্ষক

'নাট্যশাস্ত্র' পাঠে দেখা যায় যে, নাট্যানুষ্ঠানের উৎকর্ষ অপকর্ষ শুধু অভিনেতাদেরই উপরে নির্ভর করে না ; এতে দর্শকের ভূমিকাও নগণ্য নয়।

শাস্ত্রের বিধান এই যে, দর্শকের রসিক ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া দরকার। যে-চরিত্রের ভূমিকা-অভিনীত হয়, সেই চরিত্রের মনোভাব ও অনুভূতি নিজের মতো করে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দর্শকের থাকা আবশ্যক। গুণাগুণভেদে দর্শক হতে পারে উত্তম, মধ্যম বা অধম। অবস্থাভেদে অভিনীত বিষয়ের রসোপলব্ধির নিদর্শনস্বরূপ দর্শক মাঝে মাঝে নিম্নলিখিতরূপে বাহ্যিক প্রকাশ দেখাবেন: হাসি, অশ্রু বিসর্জন, আসন থেকে উল্লম্ফন, হাততালি, ভয় আতংকাদি-ব্যঞ্জক অন্যান্য চিহ্ন। নাট্যানুষ্ঠানের সমালোচককে বলা হয়েছে প্রাশ্নিক; তাঁর বিচারবুদ্ধি পরিণত হওয়া আবশ্যক।

প্রেক্ষাগৃহ

এই সম্বন্ধে 'নাট্যশাস্ত্রে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার দ্রষ্টব্য। এই স্থান বোঝাতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে; নাট্যবেশ্ম, নাট্যগৃহ, নাট্যমণ্ডপ, রঙ্গশালা, রঙ্গভূমি, রঙ্গমণ্ডপ, প্রেক্ষাগৃহ। প্রথম তিনটি শব্দে সম্পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহটি বোঝায়। রঙ্গভূমি বোধ হয় রঙ্গমঞ্চকে বোঝায়। রঙ্গশালা বা রঙ্গমণ্ডপে প্রেক্ষাগৃহ অভিপ্রেত।

নাট্যগ্রন্থে বৃত্তি ও ভাষা

যে সকল ভাবে নাট্য বিষয় বর্ণিত হতে পারে সেগুলি ভরতের মতে চার-প্রকার; যথা—কৈশিকী (ললিতভাব), সাত্বতী (চমৎকার), আরভটী (প্রচণ্ড), ভারতী (বাঙ্ময়)। কৈশিকী শৃঙ্গারে উপযোগী; এতে থাকে নৃত্ত, গীত, সুন্দর সজ্জা, নারীপুরুষের ভূমিকা, প্রেমের বর্ণনা, পরিহাস ইত্যাদি।

বীর, অদ্ভুত ও ভয়ানকে এবং কিছুপরিমাণে করুণ ও শৃঙ্গারে সাত্বতী প্রযোজ্য। এতে সাহস, আত্মত্যাগ, সহানুভূতি, ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি দেখান হয়, কিন্তু শোক দুঃখ নয়।

ভয়ানক রসে আরভটী প্রযোজ্য। এতে বর্ণিত হয় ইন্দ্রজাল, মন্ত্রপ্রয়োগ, সংঘর্ষ, ক্রোধ, ভীষণতা ও অসাধু পদ্ধতি। অন্যবৃত্তিগুলির ভিত্তি অর্থ, এর মূল শব্দ। নারীচরিত্র এটি অবলম্বন নাও করতে পারে; পুরুষ অবশ্যই সংস্কৃত কথা বলবে। নাট্যশাস্ত্রমতে, এটি বীর, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসে প্রযোজ্য।

সাধারণত রাজা, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, সেনাপতি, পণ্ডিত—এঁরা কথা বলবেন সংস্কৃতে। নারী এবং নীচস্তরের লোক প্রাকৃত ব্যবহার করবে। আঞ্চলিক

প্রাকৃতের ব্যবহার সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে অনেক বিধান আছে ; যেমন—শৌরসেনী প্রাকৃত হবে নারী, ভৃত্য প্রভৃতির ভাষা, প্রাচ্যা বলবেন বিদূষক ইত্যাদি।

লক্ষণ ও নাট্যালংকার

'নাট্যশাস্ত্রে' ৩৬ প্রকার লক্ষণ বা সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাপদ্ধতি, শৈলী ও অলঙ্কার প্রভৃতির ভিত্তিতে এইগুলির বর্ণনা আছে। ভ্রান্ত মত খণ্ডনের জন্য স্বীকৃত ঘটনার উল্লেখ, অর্থপ্রকাশের উপযোগী শব্দ প্রয়োগ, স্থান কাল আকার অনুযায়ী কোন পদার্থের বর্ণনা, কামাদিবশে বক্তব্য বিষয়ের বিপরীত বিষয় অজ্ঞাতসারে বলা ইত্যাদি সৌন্দর্যবৃদ্ধিকারী হিসাবে পরিগণিত।

'নাট্যশাস্ত্রে' নাটকালংকারের বর্ণনা আছে। কাব্যের ন্যায় নাট্যেও অলংকারের উদ্দেশ্য শোভাবর্ধন। উপমা এরূপ একটি অলংকার। অলংকার পঞ্চবিধ—প্রশংসা, নিন্দা, কল্পিত পদার্থের সঙ্গে সাদৃশ্য (যেমন, পক্ষযুক্ত পর্বতের সঙ্গে হস্তীর সাদৃশ্য) সম্পূর্ণ সাদৃশ্যমূলক (যেমন, মুখখানি চন্দ্রতুল্য), আংশিক সাদৃশ্যমূলক (যেমন, মুখখানি চন্দ্রসদৃশ, চোখ দুটি নীলপদ্মতুল্য)। রূপক, দীপক, যমক প্রভৃতিও নাটকালংকাররূপে পরিগণিত হয়েছে।

নৃত্ত, গীত ও বাদ্য, করণ, চারী, স্থান

নৃত্ত, গীত ও বাদ্য নাট্যের অঙ্গ। 'নাট্যশাস্ত্রে' নৃত্ত দ্বিবিধ—তাণ্ডব ও লাস্য। প্রথমটি প্রচণ্ড, দ্বিতীয়টি কোমল। লাস্যের দশ প্রকার ভাগ করেছেন ভরত ; এতে গীত ও নৃত্ত অপরিহার্য। অভিনবগুপ্ত নৃত্তের সপ্তবিধ ভাগ বলেছেন :

শুদ্ধ—এতে অঙ্গহারাদি থাকে।

গীতকাদ্যভিনয়যুক্ত—এতে সাধারণভাবে গানের অভিনয় থাকে।

গানক্রিয়ামাত্রানুসারি—বাদ্যতালানুসারি।

উদ্ধত—সবেগ।

সুকুমার—কোমল।

উদ্ধত সুকুমার—বেগপূর্ণ অথচ কোমল।

সুকুমারোদ্ধত—কোমল অথচ বেগপূর্ণ।

গান হতে পারে বাদ্যসহ বা বাদ্যবর্জিত, একক বা দ্বৈতও হতে পারে। প্রচ্ছেদক গানে নারী প্রিয়ের বিশ্বাসঘাতকতাজনিত শোক বীণা বাজিয়ে প্রকাশ করে। সৈন্ধব গান বিপ্রলব্ধা নারীর সঙ্গে গীত হয়। দ্বিগূঢ়ক দ্বৈত

সংলাপের আকারে রঙ্গপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ গান। উত্তমোত্তক গানে প্রেমের বিপর্যয়ের তিক্ততা প্রকাশিত হয়। উক্তপ্রত্যুক্ত দ্বৈত সঙ্গীত ; এতে প্রেমিক অপরকে কপট তিরস্কার করে। বাদ্য সম্বন্ধে কুতপ শব্দটি উল্লেখযোগ্য। এর অর্থ বাদ্যবৃন্দ, অথবা যে যন্ত্রের উপরে বাদ্যযন্ত্র স্থাপিত হয় তার নাম।

নৃত্ত প্রসঙ্গে করণ, মণ্ডল, চারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হস্তের যে ভঙ্গীবিশেষ বিবিধ ভাব প্রকাশ করে তাকে বলে করণ। করণ চারটি—আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, ব্যাবৃত্ত ও পরিবর্তিত। চরণ, বক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানাবিধ ভঙ্গীও বর্ণিত হয়েছে। চারী শব্দে বোঝায় কটিদেশের নিম্নস্থ প্রত্যঙ্গসমূহের বিশেষ প্রকার সঞ্চালন। কতক চারীর সংযোগে সৃষ্ট হয় মণ্ডল। চারীর ন্যায় মণ্ডলও হতে পারে ভৌমী (যা মাটিতে দাঁড়িয়ে হয়। ও আকাশিকী (যা শূন্যে হয়)।

স্থান বলে একটি শব্দ আছে। এর দ্বারা বিশিষ্ট প্রকার অবস্থান বোঝায়।

পূর্বরঙ্গ

নাট্যানুষ্ঠান আরম্ভ করার পূর্বে কতকগুলি অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠান-গুলির নাম :

প্রত্যাহার—বাদ্যযন্ত্রের স্থাপন ;

অবতরণ—বাদকদের আসন গ্রহণ ;

আরম্ভ—গানের আরম্ভ ;

আশ্রাবণা—বাদ্যযন্ত্রে স্বরারোপ ;

বক্ত্রপাণি—বাদ্যযন্ত্রবাদনের রিহার্সাল ;

পরিঘট্টনা—বাদ্যযন্ত্রের তারে বাদন ;

সংঘোটনা—তালসূচক বিভিন্ন প্রকার হস্ত সঞ্চালন ;

মার্গাসারিত—অবনদ্ধ ও ততবাদ্যের যুগপৎ বাদন ;

আসারিত—তাল সংক্রান্ত কলাপাতাদির বিভেদ।

উক্ত অঙ্গগুলি ছিল অন্তর্যবণিকা অর্থাৎ যবনিকার অন্তরালে। নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি ছিল বহির্যবণিকা :

গীতবিধি—দেবতার স্তুতিবিষয়ক গান ;

উত্থাপন—নান্দীশ্লোকের আবৃত্তি ;

পরিবর্তন—ত্রিভুবনের অধিদেবতাগণের উদ্দেশে স্তুতি ;

নান্দী—প্রস্তাবনা।

শুষ্কাবকৃষ্টা—এটি ছিল অবকৃষ্টা ধ্রুবা; এতে অর্থহীন গানের অক্ষর থাকত।
রঙ্গদ্বার—এখান থেকেই নাট্যগ্রন্থের বা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত;
চারী—শৃংগারসূচক অঙ্গভঙ্গী;
মহাচারী—ভয়ানক রসসূচক অঙ্গভঙ্গী;
ত্রিগত—বিদূষক, সূত্রধার ও পারিপার্শ্বকের সংলাপ;
প্ররোচনা—সূত্রধারকর্তৃক প্রেক্ষকগণের প্রতিভাষণ।

রঙ্গমঞ্চে প্রবেশপদ্ধতি

প্রবেশের কতক নিয়ম পালনীয়। কামার্তরাজা প্রবেশ করলে যবনিকার অপসারণের পরে করবেন। তিনি মঞ্চের পেছনের অংশে থাকবেন। বিদূষক সানন্দে প্রবেশ করবেন মঞ্চের সামনের দিকে। পরিক্রমা করে তিনি রাজার কাছে যাবেন। বিদূষকসহ রাজা মঞ্চের পেছনে শেষপ্রান্তে মাধবীকুঞ্জে আসবেন।

ভরতবাক্য

নাট্যানুষ্ঠানের শেষে সকলে মিলে যে প্রশস্তি বা আশীর্বাদসূচক শ্লোক আবৃত্তি করেন তাকে বলে ভরতবাক্য। নাটশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতের নামে বোধহয় এর নামকরণ হয়েছে। অথবা নটনটীদেরকে বলা হয় ভরত; তাঁরা সকলে পাঠ করতেন বলে বোধহয় এই নাম হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রকাশিত গ্রন্থাদির বিবরণ

এই পর্যন্ত নাট্যশাস্ত্রসম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ যে আলোচনা করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

ভরতের পরিচয়, জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন কীথ তাঁর Sanskrit Drama গ্রন্থে এবং সুশীলকুমার দে তাঁর Sanskrit Poetics গ্রন্থে। রঙ্গাচার্যের Introduction to Bharata's Natyasastra এবং ভরলেকারের Studies in Natyasastra গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। জার্মান পণ্ডিত হেম্যান এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন।[১] সিলভা লেভি 'নাট্যশাস্ত্রের' অংশবিশেষ[২] (১৭-২০ বা ঘোষের

১. দ্র: Uber Bharata Natyasastram......der Wissenschften, Govttingen, 1874

২. The Theatre indien, 1890.

সংস্করণে ১৮-২২) ও ৩৪ তম অধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। নাট্য-বিষয়ক পরবর্তী গ্রন্থগুলির (যথা, 'দশরূপক,' 'সাহিত্যদর্পণে'র ষষ্ঠ অধ্যায়) সঙ্গে 'নাট্যশাস্ত্রে'র তুলনামূলক অধ্যয়ন তিনিই সর্বপ্রথম করেছিলেন।

'নাট্যশাস্ত্রে'র কাল সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন সর্বপ্রথম পলরেগ্‌নড[৩]। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[৪], ম্যাকবি[৫], কানে[৬] প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে গবেষণাত্মক রচনা প্রকাশ করেছেন।

মনোমোহন ঘোষ 'নাট্যশাস্ত্রে'র সংস্করণের ও ইংরেজী অনুবাদের সূচনায় এ বিষয়ে নানা মতের বিচার করে নিজস্ব মত লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় (১৮-২০ এবং ৩৪) হল্ সাহেব তাঁর 'দশ-রূপকে'র সংস্করণের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশ করেছিলেন ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে। 'নাট্য-শাস্ত্রের অংশবিশেষের এই বোধহয় সর্বপ্রথম মুদ্রণ। এরপর সম্পূর্ণ গ্রন্থের সংস্করণের পরিকল্পনা করেও তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তা পরিত্যাগ করেন। ফরাসী পণ্ডিত রেগ্‌নড্‌ ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ১৭শ (ঘোষের সংস্করণ ১৮শ) ও ১৮৮৪তে ১৫শ (আংশিক) এবং ১৬শ অধ্যায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৮৪তেই তিনি ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় প্রকাশ করেন। অলংকার ও ছন্দের উদাহরণস্বরূপ লিখিত শ্লোকগুলি থেকে রেগ্‌নড্‌ অনুমান করেন যে, 'নাট্যশাস্ত্র' সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের গ্রন্থ। রেগ্‌নডের ছাত্র গ্রসেট নামক অপর একজন ফরাসী পণ্ডিত ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ২৮শ অধ্যায় অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে কাব্যমালা সিরিজে (৪২) 'নাট্যশাস্ত্র' প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে উল্লিখিত গ্রসেটের সংস্করণ (১-১৪) প্রকাশিত হয়। ১৯২৬-৪৪ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত এই গ্রন্থের অভিনবগুপ্ত-রচিত টীকা সহ সংস্করণ প্রকাশিত করেন রামকৃষ্ণ কবি। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইএর নির্ণয়সাগর প্রেস এবং ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীর চৌখাম্বা থেকে যথাক্রমে দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মনোমোহন ঘোষ এই গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশ করেছেন।

---

৩. Le Dix-septieme chapitre du Bharatiya-natyasastra, Annals du Musee Cuimet, Tome I, 1880.

৪. Journal and Proceedings of Asiatic Society, Bengal, V.

৫. 'ভবিসয়ত্তকহা' নামক গ্রন্থের ভূমিকা।

৬. Indian Antiquary, Xt, 1917, History of Sanskrit Poetics.

'নাট্যশাস্ত্রে'র বিভিন্ন বিষয় ও পারিভাষিক শব্দাদির আলোচনা আছে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে :

Le Gitalamkara : Sur la musique Edition Critique traduction Francaise et introduction. Par Danielon et N. R. Bhatt, Pondichery.

Bharata-kosa—Compiled—M. R. Kavi.
Revised Edition—V. Raghavan.

Bharata-Natya-Manjari, Poona.

A Fresh light upon······Srinyara-rasa in the Natyasastra, Summaries of Papers, All-India Oriental Conference.

The Four Demeanours in the Natyasastra, Summaries of Papers, Al-India Oriental Conference.

Erotics in the Natyasastra, Ibid.

নাট্যশাস্ত্রের মূল্য

ভারতীয় নাট্যকলার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই গ্রন্থের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর রচনা বা সংকলনকাল যাই হোক, এই বিষয়ে এই গ্রন্থই প্রাচীনতম।

সঙ্গীতের নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিন শাখা সম্বন্ধেও 'নাট্যশাস্ত্র'ই প্রাচীনতম গ্রন্থ। সুতরাং, এই বিষয়ের ইতিহাসেও এই গ্রন্থের মূল্য যথেষ্ট।

এই গ্রন্থে (১৪শ, ১৮শ, ২৩শ অধ্যায়) ভৌগোলিক তথ্যও প্রচুর আছে। এতে নিম্নলিখিত স্থানগুলির উল্লেখ আছে।

অঙ্গ, অস্তগিরি, অন্ধ্র, অবন্তি, অর্বুদেয়, আনর্ত্ত, উৎকলিঙ্গ, উশীনর, ওড্র, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, কোসল, তাম্রলিপ্ত, তোসল, ত্রিপুর, দর্শার্ণ, দাক্ষিণাত্য, দ্রমিড়, নেপাল, পঞ্চাল, পুলিন্দ, পৌণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, প্রবঙ্গ, প্রাঙ্গ, বহির্গিরি, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মগধ, মদ্রক, মলদ, মলবর্ত্তক, মার্গব, মালব, মহাবৈন্না, মহেন্দ্র, মৃত্তিকাবৎ, মোসল, বঙ্গ, বৎস, বনবাস, বাহ্লীক, বিদিশা, বিদেহ, শূরসেন, শাম্বক, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, সৌবীর।

তোসল, মোসল নামগুলি অতি প্রাচীন। পরবর্তীকালে এই নাম লুপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

চর্মন্বতী, বেত্রবতী, গঙ্গা ও মহাবৈরা নদীর উল্লেখ আছে। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, মেকল, কালপঞ্জর, হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের নাম এই গ্রন্থে আছে। ভারতবর্ষ, জম্বুদ্বীপ, কেতুমাল এবং উত্তরকুরুরও উল্লেখ দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই গ্রন্থ যে আলোকপাত করে তা পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে।

'নাট্যশাস্ত্র'কার এই দাবি করেন নি যে এই বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ সম্পূর্ণ। তিনি যে শেষ কথা বলেন নি তার উল্লেখ আছে ৩৬.৮৩ শ্লোকে। এতে বলা হয়েছে যে, এই গ্রন্থে যা কিছু অনুক্ত তা লোকাচার থেকে গ্রহণীয়।

এই গ্রন্থে প্রতিফলিত সমাজ-চিত্র প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, লোকের বেশভূষা, ভাষা, রীতিনীতি, রুচি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথ্য নিহিত আছে 'নাট্যশাস্ত্রে'। সেকালের চিত্রবিদ্যাদি চারুকলা এবং বিবিধ কারুশিল্পেরও পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। যৌনজীবন সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাসে 'নাট্যশাস্ত্রে'র ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যে রসবাদ অলংকার শাস্ত্রের বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে, তার উৎস 'নাট্যশাস্ত্র'।

পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্র'কে বাদ দিলে, ছন্দ সম্বন্ধেও এই গ্রন্থ প্রাচীনতম।

এতে উপজাতি[১] ও চণ্ডালাদির যে সকল উল্লেখ আছে সেগুলি ভারতীয় নৃতত্ত্বের উপাদান সংগ্রহের সহায়ক।

প্রাচীন ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের আলোচনায়ও 'নাট্যশাস্ত্র'কে বাদ দেওয়া চলে না।

এতে যে সামাজিক তথ্য আছে তার আলোচনায় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে এতে অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক কিছু তথ্যও আছে; যথা, সেনাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের গুণাবলী।

প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের চর্চায় এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। সংস্কৃত, বিশেষত প্রাকৃত সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য আছে 'নাট্যশাস্ত্রে'।

---

১. 'নাট্যশাস্ত্রে' ভারতীয় সমাজচিত্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

'নাট্যশাস্ত্রে' ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র

এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য নাট্যকলা হলেও এতে নৃত্য-গীতও আলোচিত হয়েছে, একথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বহু তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল তথ্যের সন্নিবেশ নিতান্ত আকস্মিক নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য, নাট্য, গীত প্রভৃতির আলোচনায় ও বিশ্লেষণে নানা ভাষা, বিবিধ আচার ব্যবহার, বেশভূষা, মানসিকতা প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ স্বাভাবিক।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে (১-৩৫) এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১-২৫) যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই বিবরণ থেকে সেকালে এই ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা হয়। ধ্রুবাসমূহে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন এই ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান। বর্বর, কিরাত, অন্ধ্র, শবর ও চণ্ডাল প্রভৃতির ভাষা কিরূপ ছিল তাও জানা যায়। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার কতক প্রধান লক্ষণ সূচিত হয়েছে; যেমন গঙ্গা ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভাষা এ-কারবহুল, বিন্ধ্যপর্বত ও সমুদ্রের অন্তর্বতী ভাষা ন-কারবহুল ইত্যাদি।

বেশভূষা প্রসঙ্গে তথ্য-এর জন্য এই গ্রন্থ অপরিহার্য; কারণ, একপ্রকার অভিনয়ের নামই আহার্য, অর্থাৎ যা সাজপোশাকের উপরে নির্ভরশীল। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের নারীগণের কেশবিন্যাস, বস্ত্রাদির রং সম্বন্ধে পছন্দ অপছন্দ, নারী পুরুষের ব্যবহৃত আভরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য 'নাট্যশাস্ত্রে' আছে। পুরুষ ও নারী যে সকল অলংকার ধারণ করত সেই সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে নানা তথ্য আছে।

রঙ্গালয়, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ পদ্ধতি থেকে ঐ যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। এই বিষয় রঙ্গালয় প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

'নাট্যশাস্ত্রে' (২১.৫) 'পুস্ত'[১] শব্দে রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার্য অভিনয়ের সহায়ক কতক পদার্থকে বোঝায়। বিভিন্ন প্রকার পুস্তের বর্ণনা থেকে সেকালের কারুশিল্প সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এই গ্রন্থে নির্দেশ আছে যে, রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র কঠিন উপাদানে নির্মিত হবে না; এই উদ্দেশ্যে ঘাস, বাঁশ ও গালা ব্যবহৃত হবে।

---

১. অভিনয়ের সহায়ক উপকরণ শীর্ষক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

কামকলা সম্বন্ধে 'নাট্যশাস্ত্রে' বিশেষত পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে নানা তথ্য আছে। বাৎস্যায়নের (আঃ তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে, মতান্তরে আঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) 'কামসূত্রে' এই বিষয়ে যে তথ্য আছে, 'নাট্যশাস্ত্রে'র এই আলোচনা যেন তার পরিপূরক।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে 'নাট্যশাস্ত্রে'র দান অসামান্য। পরবর্তীকালে রসের ব্রহ্মাস্বাদসহোদরত্ব, চমৎকারিত্ব, লোকোত্তরত্ব প্রভৃতি যে সকল নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা আছে তার মূল ভরতের রসসূত্র।

নাট্যরচনায় ও অভিনয়ে মনোবিদ্যার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত রস প্রসঙ্গে ভাবাদির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। তাছাড়া, নায়ক নায়িকগণের শ্রেণীবিভাগ, তাদের মানসিক অবস্থার উল্লেখ প্রভৃতিতে 'নাট্যশাস্ত্রে' মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকারের যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় আছে।

প্রেক্ষক, অভিনেতা, সমালোচক প্রভৃতির বিবরণে গ্রন্থকার সূক্ষ্ম রুচি ও বিচারবিশ্লেষণের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ে 'নাট্যশাস্ত্র' সংশ্লিষ্ট যুগের দর্পণস্বরূপ।

তখন ভারতে যে নানা উপজাতির বাস ছিল তা 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে জানা যায়। এতে নিম্নলিখিত উপজাতিগুলির নাম আছে; কাশী, কোসল, বর্বর, অন্ধ্র, দ্রমিড়, আভীর, শবর, শক ও পহ্লব। চণ্ডাল এবং যবনের উল্লেখও আছে।

'নাট্যশাস্ত্রে' প্রসঙ্গক্রমে সেনাপতি, মন্ত্রী, সচিব, প্রাড্‌বিবাক (বিচারক) প্রভৃতির গুণাবলীর উল্লেখ আছে।

৩৬.৮০ থেকে জানা যায় যে, সেকালের রাজার পক্ষে লোককে বিনা ব্যয়ে নাট্যানুষ্ঠান দেখান মহাফলজনক।

উচ্চস্তরের লোকেদের নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করত বলে নাটগণ সমাজে হেয় বলে পরিগণিত হত। নটশব্দের প্রতিশব্দ শৈলূষ; একে বলা হয়েছে জায়াজীব, অর্থাৎ যে স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে রেখে জীবিকার্জন করে। গণিকারা নটীর কাজ করত; সুতরাং তাদের সামাজিক মর্যাদা নিম্নমানের ছিল। কিন্তু নাট্যকলা ছিল আদৃত এবং কলাভিজ্ঞগণ রাজা প্রভৃতির কাছ থেকে সমাদর লাভ করত।

গ্রীক ও ভারতীয় নাট্যকলা

পূর্বে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতীয় নাট্য

গ্রীক নাট্যের প্রভাবান্বিত। এরিস্টটলের নাট্যচিন্তা ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেও একটি মত আছে।

উভয় দেশের নাট্যবিজ্ঞানে অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বৈসাদৃশ্যও কম নয়। গ্রীসদেশের নাট্যে যে Unity of placeএর নির্দেশ আছে, ঠিক তার অনুরূপ ব্যাপার ভারতে নেই। যেমন শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অংকে ঘটনাস্থল রাজপ্রাসাদ, কিন্তু সপ্তম অংকের ঘটনা ঘটল মারীচের আশ্রমে।

নাট্য যে অনুকৃতি তা উভয় দেশেই স্বীকৃত। কিন্তু, গ্রীক্ mimesis ও ভারতীয় অনুকৃতিতে মৌল প্রভেদ আছে। 'নাট্যশাস্ত্রে' এই অনুকৃতি অবস্থার। এরিস্টটলের মতে, এই অনুকৃতি action বা ক্রিয়ার।

উভয় দেশেই অভিনয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত। এরিস্টটল কিন্তু নৃত্যের উপরে জোর দেন নি। 'নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যের গুরুত্ব যথেষ্ট।

গ্রীক্ ট্রাজেডির ন্যায় ট্রাজেডি ভারতে নেই।

যবনিকা ও যবনী শব্দ যবন পদ থেকে নিষ্পন্ন বটে। কিন্তু যবন শব্দে পারস্য, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি বৈদেশিকগণকেও বোঝাত। কারও কারও মতে পারস্যদেশের চিত্রাদিসমন্বিত পর্দা (tapestry) রঙ্গমঞ্চে পশ্চাৎপটরূপে ব্যবহৃত হত বলে তাকে যবনিকা বলা হত। কোন কোন পুঁথিতে যবনিকা স্থলে যমনিকা শব্দের প্রয়োগ আছে ; যমনিকা নিরোধার্থক যম্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এর দ্বারা একটি দৃশ্যের সমাপ্তি সূচিত হত বলে যমনিকা নাম হয়েছিল।

যবনী শব্দে যদি গ্রীক রমণীই বোঝায় তা হলে অনুমান করা যায় যে, ভারতীয় রাজগণ গ্রীক বণিকদের কাছ থেকে গ্রীক্ গণিকা কিনে এনে পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করতেন। গ্রীক্ নাটকে এ প্রকার দেহরক্ষিণীর উল্লেখ নেই।

সীতাবেঙ্গা গুহাস্থিত যে রঙ্গমঞ্চের কথা বলা বলা হয়েছে, তা কাটা পাথরে মুষ্টিমেয় দর্শকদের জন্য নির্মিত একটি ক্ষুদ্র মঞ্চ। এর সঙ্গে কোন যুগের গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চের সাদৃশ্য নেই।

নাট্যগ্রন্থে যে স্মারক দ্রব্যের অবতারণা করা হয়েছে তাতে গ্রীক্ প্রভাব অনুমান করার কারণ নেই। 'রামায়ণে' দেখা যায়, অপহৃতা সীতা কর্তৃক পরিত্যক্ত রত্নাবলী দর্শনে রামচন্দ্র অপহারকের বিষয় জানতে পারেন। লংকা-প্রবাসিনী সীতার কাছে রামচন্দ্র স্মারক আংটি পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং, দেখা যায়, সুপ্রাচীন কালেই ভারতীয় সমাজে স্মারকের প্রচলন ছিল।

গ্রীক নাট্যে সম্পূর্ণ নাটকের ঘটনাবলী একদিন নিষ্পান্ন, কিন্তু ভারতীয় নাট্যে একটি অংকের ঘটনা একদিন বা অল্প কয়েকদিনে নিষ্পান্ন। তাছাড়া, সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থে কখনও কখনও দুইটি অংকের ঘটনাবলীর মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান দেখা যায়। উত্তররামচরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় অংকের মধ্যে ঘটনার ব্যবধান বারো বছরের।

গ্রীক্ প্যারাসাইট বিটের ন্যায় মার্জিত নয়।

উভয় দেশের নাট্যগ্রন্থে প্রস্তাবনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভারতীয় প্রস্তাবনায় পূর্বরঙ্গের প্রতি নাট্যকারের মনোযোগ অধিকতর।

উল্লিখিত যুক্তিগুলি থেকে গ্রীস্‌দেশের নিকট ভারতের অধমর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যও তেমনই আছে। শুধু কয়েকটি সাদৃশ্য একের নিকট অপরের ঋণ প্রমাণ করে না। উভয় দেশের নাট্যকলা সম্ভবত স্বাধীনভাবেই উদ্ভূত ও বিবর্ধিত হয়েছিল; সাদৃশ্য যা আছে তা আকস্মিক হতে পারে।

গ্রীস থেকে কিছু নাট্যোপকরণের আমদানী ভারতে হয়ে থাকলেও ভারতীয় কলাকুশলীরা স্বীয় প্রতিভার স্পর্শে তাকে এমন স্বকীয় করে নিয়েছিলেন যে তাতে বৈদেশিক প্রভাব আবিষ্কার করা দুরূহ।

নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব

নাট্যকলা সংক্রান্ত এবং অলংকার শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রভাব আলোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে কাব্যনাট্য গ্রন্থাবলীতে এই গ্রন্থের বিধিনিষেধ কতটা অনুসৃত হয়েছে তা লক্ষ্য করা যাবে।

কালিদাসের কতক গ্রন্থে ভরতের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নিয়মের অনুসরণ স্পষ্ট। নাট্যশাস্ত্রের কাল প্রসঙ্গে কালিদাসের উপরে ভরতের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা হয়েছে। 'কুমারসম্ভবে' (৭.৯০ থেকে, ১১.৩৬) শিব পার্বতী তাঁদের বিবাহ উপলক্ষ্যে নাট্যানুষ্ঠান দেখেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। এতে বিভিন্ন বৃত্তি ও সন্ধির সংযোগের কথা আছে। সঙ্গীত রসানুসারী ছিল বলে উক্ত হয়েছে।

'মুদ্রারাক্ষসে' (৪.৩) রাক্ষস রাজনৈতিক সংহতিকে নাট্যকারের কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং নাট্যগ্রন্থের কাঠামো বর্ণনা করছেন; এ ধারণা নাট্যশাস্ত্রপ্রভাবিত মনে হয়। ভবভূতি (মালতীমাধব) ও মুরারি (অনর্ঘরাঘব

৬.৪৮) এই শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ ও বিধির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে সহজেই মনে হয়।

পণ্ডিতপ্রবর কীথ্ যথার্থই বলেছেন[১] যে, পরবর্তীকালে যে, নাট্যগ্রন্থের কোন নূতন আকার সৃষ্ট হয় নাই তাও নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব। এই শাস্ত্রে যে কয়টি প্রকারের নাট্যগ্রন্থ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে কোন নাট্যকার যান নি বা যেতে সাহস পান নি।

'মৃচ্ছকটিকে' গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম আছে। এর কারণ 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রতি আনুগত্যের অভাব নয়। এই প্রকরণটির উপজীব্য খুব সম্ভব ভাসের 'চারুদত্ত'। ভাস ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান্ নাট্যকার। তা ছাড়া, ভাস-তারকা সম্ভবত এমন সময়ে নাট্যগগনে উদিত হয়েছিলেন যখন 'নাট্যশাস্ত্র' রচিত হয় নি অথবা স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। ভাসের কিছু নাট্যগ্রন্থে শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য করে রঙ্গমঞ্চে নৃত্য দেখান হয়েছে। এমন হতে পারে যে নাট্যশাস্ত্র ভাসের পরবর্তী। 'উরুভঙ্গ'কে ট্রাজেডি মনে হতে পারে। এরও কারণ বোধ হয় সে যুগে নাট্যশাস্ত্রের গভীর প্রভাবের অভাব অথবা নাট্যশাস্ত্র তখনও রচিত হয় নি। অবশ্য ধর্মভীরু দর্শক একে ট্রাজেডি মনে করবেন না; কারণ যার ধ্বংস বর্ণিত হয়েছে তিনি দুষ্ট। এরূপ লোকের বিনাশ আনন্দদায়ক।

সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ যে বিয়োগান্তক নয়, তাও 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রভাবপ্রসূত বলে মনে হয়। ঐ গ্রন্থে এরূপ রচনা যে নিষিদ্ধ, তা পূর্বে লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়ের পুস্ত[২] নামক আনুষঙ্গিক উপকরণের ব্যবহারের নির্দেশ আছে, মনে হয় তারই প্রভাবে 'উদয়নচরিতে' হাতি তৈরির কথা জানা যায়। 'মৃচ্ছকটিক' নামটিই বোধহয় এই নির্দেশ অনুযায়ী হয়েছে; এর অর্থ মাটির ক্ষুদ্র শকট বা গাড়ি। 'বালরামায়ণে' যন্ত্রচালিত পুতুলের কথা আছে। বাড়ি, গুহা, রথ, ঘোড়া, বানর প্রভৃতি পুস্তশ্রেণীর অন্তর্গত।

শার্ঙ্গদেবের (১৩ শতক) 'সঙ্গীতরত্নাকরে,' বিশেষত এর নর্তনাধ্যায়-এ নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট। শার্ঙ্গদেব ভরতের নামোল্লেখও করেছেন। (যথা স্বরগতাধ্যায় ১।১৫, নর্তনাধ্যায় ৪)।

নৃত্য ও নাট্য ঘনিষ্ঠসম্বন্ধযুক্ত। নৃত্যে প্রযুক্ত হস্তমুদ্রা পদসঞ্চালনরীতি

---

১. Sanskrit Drama, 1924, p. 352.

২. অভিনয়ের সহায়ক উপকরণ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি অভিনয়েও ব্যবহৃত হত। ভারতের ভাস্কর্যে নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গি রূপায়িত হয়েছে। এই জাতীয় মূর্তিশিল্পে 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রভাব অনুমেয়। সমরাঙ্গণসূত্রধার নামক বিশাল গ্রন্থে, মূর্তিনির্মাণ প্রসঙ্গে যে হস্তভঙ্গীগুলির উল্লেখ আছে তাতে নাট্যশাস্ত্রের ভাবগত এমন কি ভাষাগত প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রন্থখানি ভোজদেবের (১১শ শতক) নামাংকিত।

পরবর্তী কালের অলংকারশাস্ত্রে নাট্যশাস্ত্রের, বিশেষত এই শাস্ত্রোক্ত রস-সূত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। নাট্যপ্রসঙ্গে ভরত যে রসের কথা বলেছিলেন, তা কাব্যের ক্ষেত্রেও গৃহীত হয়েছিল; শুধু গৃহীত নয়, রস কাব্যের আত্মা বলে স্বীকৃত হয়েছিল। ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন (৯ম শতক) 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে রস ধ্বনিকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলেছেন। মম্মট (১১শ-১২শ শতক) 'কাব্য প্রকাশে' রস সূত্রের বিশ্লেষণ করে রসের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। বিশ্বনাথ (১৪শ শতক) 'সাহিত্যদর্পণে' স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্; রস যার আত্মা সেই বাক্য কাব্য। তাঁর মতে রস ছাড়া কাব্যের অস্তিত্বই নাই। জগন্নাথের (১৭শ শতক) 'রসগঙ্গাধরে'র নাম থেকেই বোঝা যায়, রস সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা। রসসূত্রের সর্বাধিক প্রামাণ্য ব্যাখ্যাতা অভিনবগুপ্তের (১০ম-১১শ শতক) অভিব্যক্তিবাদ পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

রুদ্রভট্টের 'শৃঙ্গারতিলক', ভোজের 'শৃঙ্গারপ্রকাশ', সারদাতনয়ের 'ভাব-প্রকাশ', শিঙ্গভূপালের 'রসার্ণবসুধাকর', ভানুদত্তের 'রসতরঙ্গিণী' ও 'রসমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থে রসবাদের, বিশেষত শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে।

'অগ্নিপুরাণে'র অলংকার প্রকরণে শৃঙ্গাররসের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হয়েছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে উজ্জ্বল বা মধুর নামে শৃঙ্গাররসের শ্রেষ্ঠত্ব আলোচিত হয়েছে।

□□□□□□□ সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু □□□□□□□

প্রথম অধ্যায়

প্রথমে নমস্ক্রিয়ার পরে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে মুনিগণ ভরতমুনিকে নাট্যবেদের উৎপত্তি, স্বরূপ ও প্রয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করেন।

প্রাচীনকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মাকে এমন একটি পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেন, যা যুগপৎ শ্রবণ ও নয়নের রঞ্জক এবং সর্ববর্ণগ্রাহ্য। তৎপর ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ থেকে যথাক্রমে পাঠ্যবস্তু, অভিনয়, গান ও রস নিয়ে নাট্যবেদ সৃষ্টি করলেন।

এই নাট্যবেদ দেবগণের মধ্যে প্রয়োগার্থে প্রবর্তিত হউক—এই মনোভাব ব্রহ্মা প্রকাশ করলে ইন্দ্র বললেন যে, দেবগণ নাট্যকর্মের যোগ্য নন; ঋষিগণ এই বেদ প্রয়োগে সক্ষম। তৎপর ব্রহ্মার আদেশে ভরত শত পুত্রের সাহায্যে নাট্যবেদের প্রয়োগ করেন। এতে ভারতী, সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী বৃত্তি অবলম্বিত হয়েছিল। নাট্যবেদপ্রয়োগের জন্য ব্রহ্মা অপ্সরাগণকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং বাদ্যের জন্য স্বাতি ও গানের জন্য নারদাদি স্বর্গীয় সঙ্গীতজ্ঞগণকে নিযুক্ত করেন।

নাট্যানুষ্ঠান প্রথমে হয় ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে। তাতে দেবগণ কর্তৃক দৈত্যগণের পরাজয় অভিনীত হলে, রুষ্ট দৈত্যগণ দারুণ বাধার সৃষ্টি করে; ফলে নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এতে কুপিত দেবরাজ ধ্বজাদণ্ড তুলে জর্জর নামক ধ্বজা দিয়ে বিঘ্নকারিগণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেন। তখন থেকে জর্জর হল নাট্যানুষ্ঠান ও অভিনেতাদের রক্ষক।

তারপর নাট্যানুষ্ঠান চলতে থাকলে বিঘ্নকারিগণ অভিনেতাদের ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। তখন ভরতের অনুরোধে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা রঙ্গালয় নির্মাণ করলেন। ব্রহ্মার আদেশে দেবগণ রঙ্গালয়ের বিভিন্ন অংশের রক্ষায় নিযুক্ত হলেন। যক্ষ পন্নগাদি রঙ্গমঞ্চের তলদেশ রক্ষায় নিযুক্ত হল। অভিনেতাদেরকেও দেবতারা রক্ষা করতে থাকেন।

নাট্যানুষ্ঠানে তারা কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করছে—ব্রহ্মার এই প্রশ্নের উত্তরে দৈত্যগণ বলল যে, এই অনুষ্ঠানের দ্বারা তাদেরকে লজ্জা দেওয়া হয়েছে[১]; কারণ, দেব ও দৈত্য উভয়েই ব্রহ্মা থেকে নির্গত। নাট্যবেদের স্বরূপ ও উপকারিতা

১. দ্রঃ ৫৫ (খ) এর অনুবাদ।

সম্বন্ধে বলে ব্রহ্মা তাদেরকে ক্রোধ পরিত্যাগ করতে বলেন। তিনি বললেন যে, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অনুকরণ এতে আছে এবং এই নাট্য সকলের আনন্দদায়ক।

নাট্যমণ্ডপে যথাবিধি বলিদান, হোমাদিসহ সোপচার পূজা করতে দেবগণকে ব্রহ্মা আদেশ দিলেন; এর ফলে তাঁরাও মর্ত্যে পূজা পাবেন। রঙ্গপূজা ব্যতিরেকে নাট্যানুষ্ঠান করণীয় নয়।

অবশেষে ব্রহ্মা ভরতমুনিকে রঙ্গপূজা করতে আদেশ দিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভরতের কথা শুনে মুনিগণ রঙ্গালয় ও রঙ্গসংক্রান্ত পূজা অনুষ্ঠানাদি জানতে চাইলেন।

রঙ্গালয় ত্রিবিধ। বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র। আয়তন অনুসারে রঙ্গালয় তিনপ্রকার—জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর। এদের দৈর্ঘ্য, হাত ও দণ্ড অনুসারে, যথাক্রমে ১০৮, ৬৪ ও ৩২। দেবতা, রাজা ও অন্যলোকের পক্ষে যথাক্রমে এই তিনটি উপযোগী। মর্ত্যবাসীর রঙ্গালয় হবে ৬৪ × ৩২ হাত[১]।

অতি বৃহৎ রঙ্গালয়ে অভিনয় ভাবব্যঞ্জক হয় না, যা বলা হয় তা অত্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মধ্যম রঙ্গালয়ই উপযোগী।

রঙ্গালয়ের উপযোগী ভূমি হবে সমতল, দৃঢ়, সাদা ভিন্ন অন্য রঙের বা কালো। নির্বাচিত ভূমিকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে পেছনের অংশটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে হবে। এদের সম্মুখের ভাগে নির্মিত হবে রঙ্গশীর্ষ এবং পেছনের ভাগে নেপথ্যগৃহ।

শুভনক্ষত্রে বাদ্যসহযোগে ভিত্তিস্থাপন, সোপকরণ, দেবপূজা প্রভৃতি করণীয়। শুভানুষ্ঠানে রাজা, ব্রাহ্মণ ও কর্তাদেরকে (অভিনয়কারী, নাট্যকার ?) ভোজন করাতে হবে।

ভিত্তিস্থাপনের পরে নির্দিষ্ট দিকে, যথাবিধি সজ্জাসহ ব্রাহ্মণস্তম্ভ, ক্ষত্রিয়স্তম্ভ, বৈশ্যস্তম্ভ ও শূদ্রস্তম্ভ স্থাপনীয়। ব্রাহ্মণগণকে মণিমাণিক্য, গাভী, বস্ত্রাদি দানপূর্বক স্তম্ভসমূহ উত্তোলনীয়।

রঙ্গমঞ্চের প্রতি পার্শ্বে নির্মিত হবে রঙ্গমঞ্চের ন্যায় দীর্ঘ এবং সার্ধহস্ত উচ্চ মত্তবারণী[২]; এতে চারটি স্তম্ভ থাকবে। রঙ্গমণ্ডপ (auditorium) হবে দুইটি মত্তবারণীর সমান উচ্চ।

---

১ ৮ (খ) ১১ শ্লোকে জ্যেষ্ঠাদির পরিমাপ উল্লিখিতরূপ হলেও ১৭ শ্লোকে এইরূপ আছে।

২. এই শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃহৎ হর্ম্যের চতুর্দিকে বৃতি বা বেড়া, উপরিস্থিত ক্ষুদ্র কক্ষ বা শিখর (বুরুজ), বারান্দা ইত্যাদি।

যথাবিধি কর্ম দ্বারা রঙ্গপীঠ নির্মাণ করতে হবে। রঙ্গশীর্ষ হবে দুই খণ্ড কাঠ দিয়ে তৈরি। রঙ্গশীর্ষে খোদাই করা বাঘ, দুই হাতি বা সাপ এবং কাঠের মূর্তি থাকবে। এতে জানালা ও কুহক (ventilator) থাকবে। ধারণী (তাক ?) এবং সারি সারি পায়রার খোপ থাকা আবশ্যক। রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষ রঙ্গমঞ্চের দুইটি অংশ। রঙ্গপীঠে অভিনয় করা হত। রঙ্গশীর্ষে থাকত বাদ্যবৃন্দ।

নাট্যমণ্ডপ হবে পর্বতগুহাকৃতি, দ্বিতল, ধীরগতিতে বায়ুসঞ্চালনার্থ গবাক্ষযুক্ত। বাদ্যবৃন্দের ধ্বনি যাতে গম্ভীর হয় সেইজন্য এই স্থান হবে বায়ুহীন। দেওয়ালে থাকবে অংকিত চিত্র ও আলেখ্য।

সমচতুর্ভুজ রঙ্গালয় হবে ৩২ × ৩২ হাত। ভিতরে থাকবে ছাদ ধরে রাখার জন্য দশটি স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির বাইরে দর্শকগণের বসবার জন্য ইট ও কাঠের সিঁড়ি-আকৃতি আসন নির্মিত হবে। পূর্ব পূর্ব সারি অপেক্ষা পরবর্তী সারিগুলি হবে এক হাত উঁচু। নিম্নতম সারি মেঝে থেকে এক হাত উঁচু হবে।

বিহিত অনুষ্ঠানাদির পরে উপযুক্ত স্থানে ছাদকে ধরে রাখার উপযোগী আরও ছয়টি স্তম্ভ এবং এগুলির পাশে আরও আটটি স্তম্ভ নির্মিত হবে। তারপর আট হাত সমচতুর্ভুজ পীঠদেশ নির্মাণ করে আরও স্তম্ভ নির্মাণ করতে হবে। স্তম্ভগুলি সালস্ত্রী (মূর্তি ?) দ্বারা সজ্জিত হবে।

নেপথ্যগৃহে থাকবে দুটি দ্বার ; একটি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের জন্য এবং অপরটি রঙ্গমঞ্চের দিকে মুখ করে থাকবে। এতে মত্তবারণী[১] পূর্বলিখিত পরিমাপ অনুযায়ী পীঠদেশের পাশে চারটি স্তম্ভ দিয়ে নির্মিত হবে।

রঙ্গপীঠ হবে চতুরস্র, সমতল, বেদিশোভিত এবং আট হাত (লম্বা, আট হাত চওড়া ?)

ত্রিকোণ রঙ্গালয়ে ত্রিভুজাকৃতি রঙ্গপীঠ নির্মাণ করতে হবে। রঙ্গালয়ের এক কোণে প্রবেশের জন্য একটি দরজা থাকবে, দ্বিতীয় দরজা হবে রঙ্গপীঠের পেছনে।

এই অধ্যায়ে যবনিকার উল্লেখ নেই, আছে পঞ্চম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে। যবনিকা ছাড়াও পট শব্দটির ব্যবহার আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

জিতেন্দ্রিয় শুচি নাট্যাচার্য রঙ্গালয় ও রঙ্গপীঠের অধিবাস করবেন। দেবপূজা ও বাদ্যবৃন্দের অর্চনা করে জর্জরের পূজা বিধেয়। রঙ্গের উদ্যোতন বা

---

১. এর স্বরূপ নিয়ে মতভেদ আছে। এই শব্দে কেউ কেউ বুঝেছেন, রঙ্গপীঠের সম্মুখে সারিবদ্ধ মদমত্ত হস্তী। অপর মতে, এই শব্দে বোঝায় পার্শ্বস্থিত দালান, যাকে ইংরাজীতে বলে wing.

নীরাজনাও আচার্য কর্তৃক করণীয়। হোম সমাপনান্তে নাট্যাচার্য স্থাপিত ঘটটি ভাঙবেন। এরপর নাট্যাচার্য রঙ্গালয় আলোকিত করবেন। দুন্দুভি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিসহ রঙ্গালয়ে যুদ্ধ করাতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মার আদেশে তাঁর রচিত 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' নামক নাট্যের অভিনয় করেন ভরত। অভিনয়দর্শনে ভূত, গণ প্রভৃতি এবং শিব প্রীত হলেন। পূর্বরঙ্গ দ্বিবিধ[১]—শুদ্ধ ও মিশ্র। অঙ্গহার ও অঙ্গভঙ্গী বত্রিশ প্রকার। সকল অঙ্গহারেই করণ থাকে। নৃত্যে হস্তপদের যুগপৎ সঞ্চালন করণ নামে অভিহিত হয়। করণসমূহের মোটসংখ্যা একশ' আট। করণগুলির সংজ্ঞা লিখিত হয়েছে। তারপর বিভিন্ন অঙ্গহারের বর্ণনা আছে। রেচক শব্দে বোঝায় কোন অঙ্গ পৃথক্‌ভাবে ঘোরান অথবা অন্য কোন প্রকারে সঞ্চালন। রেচক চতুর্বিধ—পাদরেচক, কটিরেচক, হস্তরেচক ও গ্রীবারেচক। পিণ্ডীবন্ধ শব্দে মনে হয়, দলবদ্ধ নৃত্যকে বোঝায়। বিভিন্ন দেব-দেবীর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পিণ্ডী-বন্ধের নামোল্লেখ করা হয়েছে। রেচক, অঙ্গহার, ও পিণ্ডী সৃষ্টি করে শিব ঐগুলি সম্বন্ধে তণ্ডুকে বললেন। তণ্ডু কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত সহ যে নৃত্য উদ্ভাবন করলেন, তার নাম হল তাণ্ডব।

বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাণ্ডবনৃত্য হয়। সাধারণত দেবপূজার সঙ্গে এই নৃত্য হলেও এর সুকুমার প্রয়োগ হয় শৃঙ্গাররসে।

খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা ও কলহান্তরিতা নায়িকার ক্ষেত্রে এবং আরও কতক স্থলে নৃত্য প্রযোজ্য নয়।

ঢাকবাদ্য কি করে হবে এবং কখন নিষিদ্ধ, সেই বিষয়ে আলোচনা করে এই অধ্যায়ের উপসংহার করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্বরঙ্গ বিষয়ে বলবার জন্য মুনিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ভরত এই সম্বন্ধে বললেন। পূর্বরঙ্গের দুটি ভাগ—অন্তর্যবনিকা ও বহির্যবনিকা। প্রত্যাহারাদি নাট্যবহির্ভূত অঙ্গগুলি যবনিকার অভ্যন্তরে বাদ্য সহকারে প্রযোজ্য।

যবনিকা অপসারিত করে নানা গীত ও নৃত্ত বাদ্য সহকারে অনুষ্ঠেয়। নান্দী ও রঙ্গদ্বার বহির্যবনিকা পূর্বরঙ্গের অন্তর্গত।

নান্দী নামের তাৎপর্য এই যে, এতে দেবতা ব্রাহ্মণ ও রাজগণের আশীর্বাদ থাকে।

---

১. পঞ্চম অধ্যায় দ্রঃ।

রঙ্গদ্বার[1] সংজ্ঞার তাৎপর্য এই যে, এর দ্বারা অভিনয়ের অবতারণা হয়।

পূর্বরঙ্গ সম্পন্ন হওয়ার পরে সূত্রধারের গুণ ও আকৃতিবিশিষ্ট স্থাপক সেখানে প্রবেশ করবেন। রঙ্গপ্রসাদনের পরে কবি বা নাট্যকারের নামকীর্তন করণীয়। তারপর নাট্যের বস্তুনির্দেশক প্রস্তাবনা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুনিগণ নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ভরতকে অনুরোধ করলেন—নাট্যে রসের রসত্ব, ভাবের তাৎপর্য সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্তের তত্ত্ব।

রস আটটি—শৃংগার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।

উল্লিখিত রসগুলির স্থায়িভাব যথাক্রমে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটি—নির্বেদ, গ্লানি, ত্রাস, আলস্য, চিন্তা ইত্যাদি। সাত্ত্বিক ভাব আটটি, যথা স্তম্ভ (অবশ ভাব) স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় (মূর্ছা)। ভাব শব্দের তাৎপর্য এই যে, ভাবগুলি রসসমূহকে ভাবায়।

বিভাব[2], অনুভাব[3] ও ব্যভিচারী ভাব ও স্থায়িভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রসনিষ্পত্তি হয়। আস্বাদিত হয় বলে রসের ঈদৃশ নাম হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

বাচিকাদি অভিনয়ের দ্বারা কাব্যের বিষয় ভাবায়, ভাব শব্দের এই তাৎপর্য। নানা অভিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত রসগুলিকে ভাবায় বলে ভাবের এই নাম।

বাচিকাদি অভিনয়াশ্রিত বিষয় বিভাবের দ্বারা বিভাবিত হয়।

বাচিকাদি অভিনয়ের দ্বারা অনুভাব বিষয় অনুভাবিত করে।

বিভিন্ন স্থায়িভাবের উদ্ভব বিশ্লেষিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

বি-অভিপূর্বক চর্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ব্যভিচারী শব্দের তাৎপর্য এই যে, এই ভাব রসসমূহে বিবিধ বস্তুর প্রতি চরণশীল। বিভিন্ন ব্যভিচারিভাবের নামকরণ ও উদ্ভব ব্যাখ্যাত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

অষ্টম অধ্যায়

অভিপূর্বক নী ধাতুর অর্থ অভিমুখে নেওয়া। আভিমুখ্যার্থনির্ধারণে, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে অর্থ নির্ণয়ে নাট্যানুষ্ঠানকে নিয়ে যায় বলে অভিনয়ের এই নামকরণ।

অভিনয় চতুর্বিধ—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। আঙ্গিক অভিনয় ত্রিবিধ—শারীর, মুখজ ও অঙ্গাদিসংযুক্ত চেষ্টাকৃত। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রয়োগ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

---

১. অভিজ্ঞানশকুন্তলাদি নাট্যগ্রন্থে প্রথমে যে শ্লোক আছে সেগুলিকে সাধারণত নান্দী বলে অভিহিত করলেও বস্তুত ঐগুলি রঙ্গদ্বার; এইরূপ শ্লোকগুলি থেকেই নাট্যকারের রচনা আরম্ভ হয়।

২. দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপন। যথা—রামের শৃংগাররসের আলম্বন বিভাব সীতা ও উদ্দীপনবিভাব চন্দ্রোদয়াদি।

৩. অনুভাব—মনোভাবের বাহ্যিক প্রকাশ; যথা কটাক্ষ, হাস্য ইত্যাদি।

সীতাবেঙ্গা গুহামঞ্চ

শেক্সপীরীয় রঙ্গমঞ্চ

গ্রীক রঙ্গমঞ্চ

চৈনিক রঙ্গমঞ্চ

ভরতের মতে নাট্যমণ্ডপ

রামগড়ের নাট্যশালা